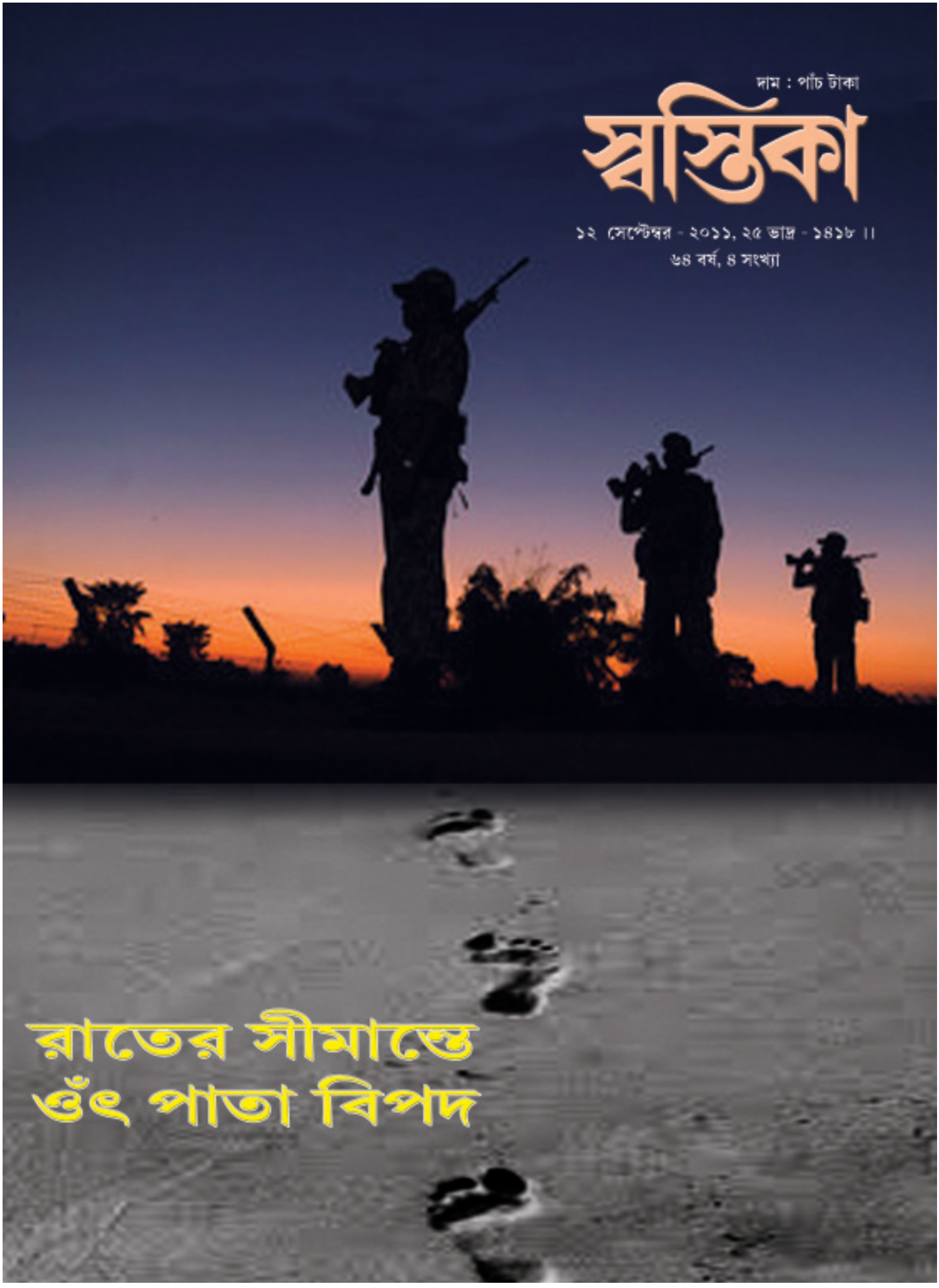

দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

১২ সেপ্টেম্বর - ২০১১, ২৫ ভাদ্র - ১৪১৮ ।।
৬৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

রাতের সীমান্তে ওঁৎ পাতা বিপদ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

পিঠ বাঁচাতে ক্যাডারদেরই বলির পাঁঠা করছেন পার্টির নেতারা ❑

খোদ প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রীদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না ❑

তালিবান এল দেশে ❑ উপানন্দ ব্রহ্মচারী ❑

গণমাধ্যম এখন প্রচার-প্রিয় এবং আয়-লোলুপ ❑ নারদ ❑

রাতের সীমান্ত : ওঁৎ পাতা বিপদ ❑

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ❑

রাতের সীমান্ত : সংকট বাড়ছে দেশের নিরাপত্তায় ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑

অসমে কেন্দ্র-রাজ্য-উলফা শান্তি বৈঠক : পর্বতের মূষিক প্রসব ❑

খোলা চিঠি : সব্জির দামে কব্জি ডোবানোই যে মহা মুশকিলের ❑ সুন্দর মৌলিক ❑

তামিলনাড়ুতে ডি এম কে নেতাদের জমি কেলেঙ্কারী ❑

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির-পর্ব - ৩ ❑

ডঃ প্রণব রায় ❑

ডাঃ আনন্দী বাঈ, যিনি স্বামীজীর আগেও আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ফেলেছেন ❑ অজিত কুমার বিশ্বাস ❑

ভিন্ন ভিন্ন সমাহারে একটি অস্ফুট মৌচাক ❑ শ্যামল ঘোষ ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ চিঠিপত্র : ❑

ভাবনাচিন্তা : ❑ নবাঙ্কুর : ❑ কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা : ❑ সমাচার-সমাচার : ❑ রঙ্গম : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিত্রকথা :

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

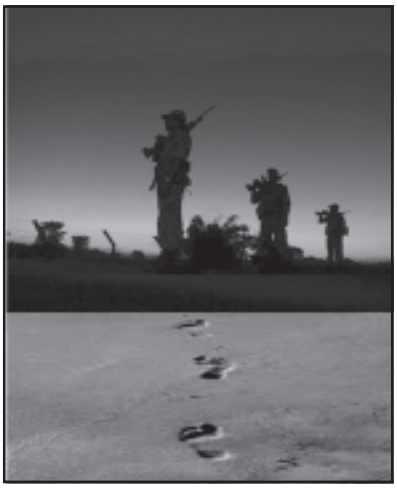

রাতের সীমান্ত : পৃঃ ১৪-১৬

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২৫ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১২ সেপ্টেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

তৃণমূল সরকারের পবিত্র সরকার বন্দনা

প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটিতে পবিত্র সরকারের নাম প্রেসিডেন্সীর নবগঠিত মেন্টর গ্রুপ সুপারিশ করিয়াছে। সেই পবিত্র সরকার যিনি বিগত বামরাজত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত দাবি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়া 'পবিত্র বাংলা' চালু করিয়াছিলেন। রাজ্য হইতে সংস্কৃত ভাষাকে বিদায় করিবার মূল হোতা তিনি। সেই পবিত্র সরকারের পুনরুত্থান হইতেছে। প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্চ গ্রুপের বিশেষজ্ঞ হিসেবে অমর্ত্য সেন-সুগত বসু এন্ড কোং পুনরায় পবিত্র সরকারকে ফিরাইয়া আনিতেছেন। অথচ বিগত বাম আমলে এই পবিত্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াই বুদ্ধিজীবীরা তৃণমূলের পালে হাওয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আজ অনেকেই কেউ মন্ত্রী হইয়াছেন, আবার কেউ সাংসদ হইয়াছেন, কেউ আবার হইয়াছেন তৃণমূল সরকারের শিক্ষাসেলের প্রধান। পবিত্র সরকারের পুনরুত্থানে মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যালেরা নীরব কেন? তাঁহারাই তো সেদিনের পবিত্র-বিরোধী আন্দোলনের মূল হোতা ছিলেন। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাম আমলে শিক্ষা ধ্বংসের মূল হোতা পবিত্র সরকার। যিনি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছেন এবং যাঁহাকে রাজ্যের মানুষ অবজ্ঞার সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টা কেন? আসলে সিপিএম পরাজিত হইয়াছে কিন্তু নির্মূল হয় নাই। গ্রামে-গঞ্জে শহরে, নগরে সিপিএমের সদস্যেরা দলে দলে নব্য তৃণমূল হইয়া যাইতেছে। আর সারস্বত কেন্দ্রগুলিও যাহাতে তাহাদের হাতছাড়া না হইয়া যায় তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে। না হইলে যে অমর্ত্য সেন বিগত বাম আমলে বুদ্ধ বন্দনা করিয়া সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করিয়াছিলেন, নন্দীগ্রাম গণহত্যার পরও নিশ্চুপ ছিলেন এবং নির্বাচনে সিপিএমকে সমর্থন পর্যন্ত করিয়াছিলেন, সেই তিনি মমতার উদার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। সুগত বসু পবিত্র সরকারের উত্থানের একজন রূপকার। পবিত্র সরকারকে লইয়া যে বিতর্ক এবং তিনিই যে বিগত সরকারের ভয়ঙ্করী শিক্ষা ব্যবস্থার নাটের গুরু সে ইতিহাস সুগত বসুর অজানা নয়। তবে কংগ্রেসী সুগত বসু একজন সিপিএমের দলদাস পবিত্র সরকারকে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বিগত চৌত্রিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বারে বারে কংগ্রেস সিপিএমের পরস্পর সৌজন্য প্রদর্শনের খেলা দেখিয়াছে। সুগত বসু সম্প্রতি নেতাজি বিষয়ক একটি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং তাহা লইয়া বিতর্কও চলিতেছে। এই বিতর্ক হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার বামপন্থীদের প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সুগত বসু নেতাজী লইয়া গালগল্প ছাপাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন।

পবিত্র সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকর্ম লইয়া এখনও ছদ্মনামে নানা প্রবন্ধ লিখিতেছেন কোনও এক দৈনিক পত্রিকায়। আবার রাজনীতিতে যুক্ত করিবার লক্ষ্যে তাঁহাকে সার্চ কমিটিতে আনার কথা বলা হইতেছে— তৃণমূল সরকারের এই দ্বিচারিতার অর্থ কি? এরপর কি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ বলিয়া বাংলা আকাদেমির প্রধান করা হইবে? এই রকম একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে তৃণমূল সরকার প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করিতেছেন—তাহা অতীব লজ্জার বিষয়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হিন্দুরাষ্ট্রের তত্ত্বটা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী এরকম একটা যুক্তির বারংবার পুনরুল্লেখ বিরক্তিকর। প্রথমত ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাটির জন্মস্থান পাশ্চাত্যভূমি, আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি বা সংযোগই নেই। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইউরোপীয় কতিপয় রাজতন্ত্র তাঁদের রাজত্বের উপর পোপের পুরোহিত তান্ত্রিক আধিপত্য রোধে তৎপর হন এবং তার উৎখাত ঘটিয়ে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবেই পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' (সেকুলার) রাষ্ট্রতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে— অপরাপর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু এক ধর্মীয় রাষ্ট্র। আমাদের দেশে এ ধরনের বিরোধী বা অসহিষ্ণুতার কোনও অবকাশ অতীতে কোনওদিন ছিল না, আজও নেই।

—শ্রীগুরুজী

ভারতকেন্দ্রিক ভাবনাই বিশ্ব শান্তি আনতে পারে : শ্রী সোনী

অনুষ্ঠানে অতুল বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ সোনী ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঁ দিক থেকে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একমাত্র ভারতবর্ষের শাশ্বত, সনাতন হিন্দু জীবনদর্শনই বর্তমান পৃথিবীকে সংকট থেকে মুক্ত করতে পারে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনরোতে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল— বিশ্বশান্তি (global peace), স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এবং পরিবেশ-এর সুরক্ষা (Protection of Enviornment)। ১২৭টি দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে সম্মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৯ বছর বাদেই দেখা গেল উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল— গ্লোবাল পীস-এর বদলে গ্লোবাল টেরর, গ্লোবাল সাস্‌টেনেব্‌ল ডেভেলপ্‌মেন্ট-এর স্থানে বৈশ্বিক মন্দা (যা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ওবামা স্বীকার করে নিয়েছেন) এবং গ্লোবাল এনভায়র্নমেন্ট প্রোটেকশন-এর পরিবর্তে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। প্রশ্ন উঠেছে এখন বিকল্প পথের সন্ধান কে দেবে? একমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই তা সম্ভব। একথা বলেছেন সুইজারল্যান্ডের 'ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট'এর প্রধান গ্রীন পীয়ার্স। তিনি বলেছেন, একমাত্র ভারতবর্ষে রয়েছে ডেমোক্র্যাসি, ডাইভারসিটি এবং সেন্স অফ্ মরাল অর্ডার— যার দ্বারা শান্তি, সুস্থিতি ও পরিবেশ রক্ষা পেতে পারে।" গত ৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের শ্রীগুরুপূজনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদন প্রেক্ষাগৃহে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। শ্রী সোনী আরও বলেন, একেশ্বরবাদী অসহিষ্ণু চিন্তাধারার ফলেই গ্লোবাল টেরর বা জিহাদ; ভোগবাদী অর্থ ব্যবস্থার ফল বৈশ্বিক মন্দা আর পৃথিবীকে ভোগ করার অধিকারের ফল গ্লোবাল ওয়ার্মিং। একমাত্র ভারতীয় চিন্তাধারাই সংযম, মাদার আর্থ কনসেপ্ট্ এবং পরমত সহিষ্ণুতার কথা বলে। এই শাশ্বত চিন্তাধারাকে নিজ নিজ জীবনে অভিব্যক্ত করতে হবে। এর কোন 'সর্টকাট' নেই। ভারত ও ভারতীয় জীবনমূল্য— এই চিন্তাধারাকেই কেন্দ্র করতে হবে। একথা বলেছেন স্বাধীন ভারতে গঠিত কোঠারী কমিশনের (শিক্ষা) প্রধান ডঃ ডি এস কোঠারি। তাঁর কথায় এদেশের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের ভরকেন্দ্র ইউরোপ হওয়াতেই বিপত্তি এসেছে।

এদিনকার অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভসের প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, সঙ্ঘের শাখায় না গেলেও তিনি মনেপ্রাণে আর এস এস। দেশ ও সমাজের পুনর্গঠন প্রয়োজন। তত্ত্ব ও ব্যবহারে এক হতে হবে। সঙ্ঘ আছে বলেই 'ভারত' আজ ভারত আছে— ইন্ডিয়া হয়ে যায়নি। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে এরাজ্যে দৃষ্টিকটুভাবে সংখ্যালঘু তোষণের তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিনকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ জয়ন্ত পাল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহানগরের সহ-কার্যবাহ শ্রীমন্ত চন্দ। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস এবং কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর অন্যতম কর্মকর্তা ভরত কুণ্ডু। সহস্রাধিক স্বয়ংসেবক গৈরিক পতাকা পূজা ও সমর্পণ করেন।

স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবার্ষিকীর প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিবেকানন্দের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী এই বিষয়ে তাদের কর্মসূচী প্রকাশ করেছে। গত ২৮ আগস্ট কলকাতায় কেশব ভবনে এই মর্মে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকও হয়ে গেছে। সমাজসেবী অরবিন্দ দাসকে সংযোজকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রমুখ মধুভাই কুলকার্নী ও পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত দত্ত বেলুড় মঠে যান। মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণামের পর মঠ-মিশনের পূজনীয় সভাপতি স্বামী আত্মস্থানন্দ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী, সহ সম্পাদক সুবীরানন্দজী ও মঠ-মিশনের পক্ষে স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী পালনের সংযোজক বিশ্বাত্মানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ ও শ্রীগুরুজীর গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, অরুণাচলে সঙ্ঘ ও মিশনের কাজ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ও চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর সাক্ষাৎকার এবং সম্প্রতি বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের বেলুড় মঠ দর্শনের কথা উঠে আসে।

স্বামীজীর সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পাঁচ দফা কর্মসূচী অর্থাৎ বিদ্যার্থী, নারী, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও জনজাতি— সমাজের এই পাঁচটি স্তরে স্বামীজীর ভাব-ভাবনাকে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী স্থির হয়েছে। বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে যেমন রামায়ণ, মহাভারতের কথা প্রচারিত ও সারাদেশে সমাদৃত করা হয়েছিল, তেমনভাবে স্বামীজীর জীবন ও বাণীকেও প্রচার যেতে পারে বলে কথা হয়। মহারাষ্ট্রে গণেশপূজা ও বাংলায় কালীপূজা যেমন পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে উদ্যোক্তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে করেন, সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে, তাঁরই জন্মতিথিও সেইভাবে পালনের কথা আলোচনা হয়। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন (গোলপার্ক) থেকে 'মাই ইন্ডিয়া, ইটারন্যাল ইন্ডিয়া' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। মঠ-মিশনের পক্ষ থেকে ২৭০-টিরও বেশি অনুষ্ঠান হবে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ২০১২-র স্বামীজীর জন্মতিথিতে স্বামীজীর পৈতৃক ভিটাতে সার্ধশতবর্ষজন্মবার্ষিকীর সূচনা হবে।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি রুখতে মন্ত্রীরা ভাবতে বসেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবশেষে টনক নড়েছে ভারত সরকারের। ভারত- চীন সরকারি বাণিজ্য ঘাটতিটা মাথায় ঢুকেছে মন্ত্রীদের। ঘাটতি আবার ঠিক দ্বিগুণ। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে দু'দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। কিন্তু প্রকৃত হিসাবটা হলো— চীন ভারত থেকে কিনেছে ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় জিনিসপত্র। ফলে ভারতের ২০ বিলিয়ান ডলার ঘাটতি রয়েছে।

গত ২০ আগস্ট দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টার পৌরোহিত্যে এ ব্যাপারে নতুন করে নীতি-কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকে বিদ্যুৎ, টেলিকম্, আই-টি এবং ভারী- শিল্প মন্ত্রকসহ বারোটি দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসাররা সামিল হয়েছিলেন। প্রত্যেক দপ্তরকে তাদের নিজস্ব উৎপাদনের ভিত্তিতে নীতি-কৌশল লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হয়েছে। শেষমেশ পাঁচদফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

● চীন কেবলমাত্র এদেশে ব্যবসা করা নয়, বিনিয়োগও করুক।

● যেক্ষেত্রে ভারত নির্ভরশীল নয় সেখানে শুল্ক বৃদ্ধি করা।

● যে সকল ক্ষেত্রে ভারত পরমুখাপেক্ষী সেক্ষেত্রে শুল্ক তুলে দেওয়া।

● চীনা কোম্পানী যে সকল জিনিস ভারত থেকে কেনে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

● যে সকল ক্ষেত্রে ভারতের জিনিসপত্র চলে (চীনে) তার এলাকা আরও বেশি করে বাড়ানো।

উল্লেখ্য, এশিয়ার আর্থিক ক্ষেত্রে চীন ও ভারত পরস্পর প্রতিযোগী। দু'টি দেশই বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য। চীন ভারতকে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রি করে থাকে। আর ভারত চীনকে সস্তা দরের কাঁচামাল বিক্রি করে। চীনের ভারতে রপ্তানীর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে তারা দশটি তৈরি জিনিস ভারতকে বিক্রি করে। সেখানে কোনও স্বল্প মূল্যের সাধারণ জিনিসই নেই। একটিই মাত্র খনিজ— ফসফরাস। চীনের ৪০ বিলিয়ন রপ্তানীর মধ্যে ২০১০-১১-তে ভারতের টেলিকম দপ্তরই ১৬ বিলিয়ন মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিল। আর ভারতের ২০ বিলিয়ন রপ্তানীর মধ্যে ৪৬ শতাংশই হলো আকরিক লৌহা। উল্লেখ্য, বেআইনীভাবে চোরাপথে সস্তার চীনা ভোগ্যপণ্য সারা ভারতই ছেয়ে ফেলেছে। ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সেদিকে নজর নেই। চাকচিক্যের মোহে সাধারণ মানুষ সে সব জিনিস ফুটপাথ ও ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে বার বার কিনছেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকেই সচেতন করতে হবে বা সচেতন হতে হবে। তা না হলে ভারতের অর্থনীতি বিরাট বাজার থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

মথুরাপুরে মৌলবাদীদের আক্রমণে জন্মাষ্টমী উৎসব বন্ধ

সংবাদদাতা।। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর থানার পূর্ব রানাঘাট গ্রামে গত ২২ আগস্ট একদল মুসলমান দুষ্কৃতীর আক্রমণে জন্মাষ্টমী উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবছরের মতো যুধিষ্ঠির পাইকের বাড়িতে এবছরও জন্মাষ্টমী উৎসবের আয়োজন হয়। পরদিন নন্দোৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পূজা-উৎসব পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে তিনি মিলেমিশে করতেন। ওইদিন বাড়ি সাজিয়ে কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে মাইকে হরিনামসহ নিজগ্রাম ও ভিন্ন গ্রামে গ্রামে যাওয়া হোত। এই অনুষ্ঠানটি মৌলবাদীদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। পূজার দিন অর্থাৎ ৪ ভাদ্র সোমবার পরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠানের উপর হামলা চালিয়ে পরিবারের ছ'জনকে আঘাত করে। দুই ভাইপোকে গুরুতর আহত অবস্থায় ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই অত্যাচারের হাত থেকে মহিলারাও বাদ যায়নি।

এ বছর পূজা ও উৎসব হয়নি। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এখনও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে যুধিষ্ঠিরবাবুর দাদা দিলীপ পাইকও একশ্রেণীর মুসলমান দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৮ কোটি?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরকারিভাবে ২০০১-এর জনগণনার রিপোর্টে ভারতে মুসলমানদের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা আরও অনেক বেশি। সম্প্রতি উইকিলিকস-এর এক কূটনৈতিক তথ্যে (Diplomatic Cables) 'ভারতীয় ইসলাম' নিয়ে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা হয়েছে। ২০০১-এর জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ। উইকিলিকস্-এর তথ্যে বলা হয়েছে, ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৬ থেকে ১৮ কোটির মধ্যে হবে। ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লীতে আমেরিকার দূতাবাস থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে বলে দাবী ।

পিঠ বাঁচাতে ক্যাডারদেরই বলির পাঁঠা করছেন পার্টির নেতারা

নিশাকর সোম

হাওড়ার সিপিএম নেত্রী ও প্রাক্তন বিধায়ক নিরুপমা চ্যাটার্জি-র শোক সভায় সিপিএমের রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, ''পার্টিতে কিছু লোক এসেছিল সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য। পার্টির কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু দেয়নি কিছুই। শুধু সম্পত্তির মালিক হয়েছে।'' বিমানবাবু তা'হলে বুঝুন, কেমন আদর্শবাদী পার্টি আপনাদের। আপনাদের আদর্শ ভোগবাদী। কাজেই সমগ্র পার্টিতে গুছিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিমানবাবু আপনি কি জানেন জনৈক পার্টি নেতা নাকি লাঞ্চ করতে টলি- ক্লাবে যান? জানেন কি পার্টি নেতারা সুরম্য অট্টালিকাবাসী, জানেন কি প্রতিটি নেতাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার আখের গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হতদরিদ্র পার্টিকর্মীদের বলা হয়েছে— ''চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়।''

আপনাদের পার্টির নেতা-মন্ত্রী গায়ে মদ ঢেলে আত্মহত্যা করে কেন? কারণ একটাই— পার্টিনীতি দু'ধরনের। একটা সাধারণ কর্মীদের জন্য, আরেকটা পার্টির নেতাদের জন্য। সিপিএম কলকাতা জেলা পার্টির দুর্নীতিগ্রস্ত লোকাল কমিটির সম্পাদককে বহিষ্কার করার জন্য দু'বছর সময় লেগেছিল— কেন? এখনও একইভাবে মধ্য কলকাতার লোকাল কমিটির সম্পাদকসহ একাধিক লোকাল কমিটির সদস্যকে বহিষ্কার করে লোকাল কমিটি ভেঙে দেওয়া হলো। পার্টিতে কেন এ-রকম ঘটে? পার্টিনেতা সদস্যদের জন্য কোনও নির্দেশিকা কি পার্টি তৈরি করেছিল? করেনি। কারণ তাতে নেতা-নেত্রীরা বিপদে পড়বেন। জ্যোতি বসু, সুভাষ চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে পার্টিবিরোধী কথা বলেও নেতা থেকে গেছেন। উল্লেখ্য সুভাষ চক্রবর্তীর প্রমোশন এবং বুদ্ধদেববাবুর মন্ত্রিসভায় প্রত্যাবর্তন এবং প্রকাশ কারাত সীতারাম ইয়েচুরির সমর্থনে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়া।

সিপিএম পার্টির রাজ্য-নেতৃত্ব বিমান বসু সমেত অনেক নেতাই শ্রমিক- কৃষক আন্দোলনে কোনওদিন হাতে কলমে কাজ করেননি। পার্টির রাজ্য- নেতা কারা? বিমান বসু গাড়ি ছাড়া একপাও চলেন না। সবসময়ে ধোপদুরস্ত পোশাকে এবং বিলাতি সিগারেটে অভ্যস্ত। তিনি মার্কসবাদের চিরায়ত সাহিত্য কতটুকু পড়েছেন? তিনি কি বাংলার ভূমি সমস্যা সম্পর্কে ভবানী সেন, সুনীল সেনগুপ্তের গবেষণামূলক পুস্তক পড়ার সময় পেয়েছিলেন? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। পরাজিত মুখ্যমন্ত্রীকে সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়েছিল। তিনি নাকি নন্দনে প্রতিদিন যেতেন, বিভিন্ন ইংরাজি সাহিত্য পড়েন। নন্দনে তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করে সেই চক্রের মধ্যে থাকতেন। তাইতো দিলীপ রায়ের মতো পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী কানু সান্যালের শোকসভায় বলেছিলেন, ''কানু সান্যালের মতো ত্যাগী নেতা এখন প্রয়োজন।'' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধবাবুর বক্তৃতা পড়ে এটা বোঝা গেল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর সিম র‍্যাথবোনকে লেখা এবং জাপানের কবি নোপুচিকে লেখা ও রোমা রঁল্যার সঙ্গে পত্রালাপ মোটেই পড়েননি। পড়ে থাকলে তাঁর বক্তৃতায় সেই বিষয়ের উল্লেখ থাকতো। অন্য নেতাদের বিদ্যা-বুদ্ধি মার্কসবাদী জ্ঞানের বহরের এবং সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া আচরণ জীবনযাত্রার জন্যই তো পার্টিকর্মীরাও 'লুটে নে দু'দিন বইতো নয়' নীতি নিয়ে ''খাও-দাও মজা কর'' চালিয়ে গেছে। আর ভোটের সময়ে মাস্‌ল-ম্যানি দিয়ে ওয়ান ডে ম্যাচ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতা হতে গেলে ওপরতলার কোনও নেতাকে ধরে পার্টির মধ্যে গোষ্ঠী তৈরি করে নিচেরতলার ক্যাডারদের ল্যাডার করে উপরে উঠতে হয়। প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত বুদ্ধ-বিমান-সুভাষ-শ্যামলদের তাঁর পরের জমানার নেতা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন কেন— কারণ এঁরা অন্ধ প্রমোদভক্ত। যদিও সুভাষ চক্রবর্তী জ্যোতিবাবুকে বলতেন ''লিডার অফ দ্য লিডার্স।'' এ যেন রাজতন্ত্র— এক রাজার পর রাজার ইচ্ছামতো যুবরাজ হবেন। এর ফলে এই নেতারা রাজকীয়ভাবে থাকার ব্যবস্থা পেয়েছিলেন। পার্টিতে নেপথ্যে কর্মীরা বলেন, নেতারা তো কর্পোরেট হাউসের ডিরেক্টর। গাড়ি করে টয়লেটেও যেতে চান! তাই এই নেতারা জোনাল কমিটির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেরা পিঠ বাঁচাচ্ছেন। খালি সাংগঠনিক দোষ— রাজনৈতিক দোষ খোঁজা হবে না। কারণ তাতে নেতারা পড়ে যাবেন। এবার জোনাল কমিটিগুলিকে ভেঙে নেতাদের পদ সুনিশ্চিত করার জন্য পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে। সম্মেলনে নেতা বিরোধীদের যাতে কোণঠাসা করা যায় তার জন্য সমস্ত নেতারা কূৎকৌশল বক্তৃতাবাজি করছেন। এতে কখনওই পার্টি দাঁড়াতে পারবে না। দেশের মাটি থেকেই মাটির আদর্শের রস সংগ্রহ করা দরকার। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ''ইন্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম টু স্লেভারি'' একটি পুস্তকে গীতা-উপনিষদ-মহাভারত উদ্ধৃত করে অতীত ভারতের ঐতিহ্যের কথা লিখেছিলেন। এই বই কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করে এবং বইটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে সিপিআই থেকে ডাঙ্গে-কে বহিষ্কার করা হয়। প্রয়াত অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি 'মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ' পুস্তকেও ঊষাস্রোতম্, মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

রাজ্যের দুই কমিউনিস্ট পার্টিতে যাঁরা নেতার আসন আঁকড়ে রয়েছেন তাঁদের ছাত্র-আন্দোলন ছাড়া কোনও অভিজ্ঞতা নেই। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁরা ব্রাঞ্চ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এরই বিপরীতে তৃণমূল আজ ক্ষমতাসীন। এই দলের সমস্ত ক্ষমতা নেত্রীর হাতে। তিনি কোনও বিষয়ে আগে ঘোষণা করেন ও পরে সেটা বিধানসভায় পেশ হয়। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ করে দিয়ে গেছে বিগত বামফ্রন্ট সরকার। তা সত্ত্বেও মহাকরণে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্ত্রীদের ঘর ফার্নিশিং করা হচ্ছে— অ্যাকোয়ারিয়াম রাখা হয়েছে। বিধায়কদের দৈনিক ভাতা ২৩৫ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনে ডিস্‌অ্যাস্টার ফোর্সকে দেওয়া হচ্ছে। এই গাড়ি চড়বেন পুলিশকর্তা- আমলারা? জনৈক তৃণমূল নেতার জন্মদিনে নাকি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে? এক 'প্রাক্তন বিপ্লবী' মন্ত্রী হয়ে তাঁর দপ্তরে কর্পোরেট কমিউনিকেশনের জাল বিছিয়েছেন। তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে কোনও নেত্রী নাকি শিল্পপতিদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা 'চাঁদা' তুলছেন? বামপন্থী অটোকর্মীরা এঁদের উৎসাহে হয়ে উঠেছেন বেপরোয়া, উদ্ধত মারমুখী।

টেন্ডার পাওয়ার জন্য তৃণমূলীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা গেছে শীতলকুচিতে। প্রচারে কোনও খামতি নেই। মুখ্যমন্ত্রীর বাজার পরিদর্শন এবং টাস্ক ফোর্স গঠনের পরই ২০ থেকে ৩০ শতাংশ সবজির দর নেমে গেছে বলে কৃষি বিপণন দপ্তর ঘোষণা করেছে। এদিকে আলুর গুদামের আলু তো এবার রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে। আলু ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে আলু রপ্তানি করতে চাইছেন। প্রচারে করা হচ্ছে ১৪০০০ শহুরে বেকারকে চাকরি দিয়েছে। শাসনেও তৃণমূল কর্মীদের নিজেদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছে-হচ্ছে।

খোদ প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রীদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না

গূঢ়পুরুষের

কলম

দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকারের জনসমর্থন তলানিতে ঠেকেছে। সম্প্রতি আন্না হাজারের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে তার ধাক্কায় মনমোহন কোম্পানীর অফিসের সদর দরজায় তালা পড়ে গেছে। দিল্লীতে ক্ষমতাসীন মনমোহন মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা অকাজে, কুকর্মে যতটা দক্ষ ততটাই অদক্ষ প্রশাসনিক কাজে কর্মে। তাই আন্না হাজারের অনশনসভায় পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে এইসব মন্ত্রীরা দুর্নীতির কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। পারেনি। উল্টে জনরোষের মুখে পড়ে সরকারই নতজানু হয়। এইসব কোটি কোটি টাকার মালিক মন্ত্রিদের আরামে বিলাসে রাখতে দেশবাসীকে তাদের ঘাম রক্ত ঝরানো উপার্জনের টাকা কর হিসাবে দিতে হচ্ছে। সংসদের কাজকর্ম অচল করতে হল্লাবাজ সাংসদদের মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা জনগণকে দিতে হচ্ছে। আমাদের দেশে জনপ্রতিনিধিদের কোনও দায়বদ্ধতা আছে বলে মনে হয় না। যদি বা থাকেও তা' কাগজে কলমে। মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই শপথ বাক্যের কথা বেবাক ভুলে যান। আমি বাজি রেখে বলতে পারি শপথ অনুষ্ঠানের পরের দিন সকালে মন্ত্রিদের শপথ বাক্যগুলির পুনরাবৃত্তি করতে যদি বলা হয় তবে প্রতি দশজন মন্ত্রীর আটজনই ডাহা ফেল হবেন।

আন্না হাজারে সম্প্রতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনশন সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার পর সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে ভারত জুড়ে জনমত সমীক্ষা করা হয়। স্টার নিউজ-নিয়েলসনের এই যৌথ সমীক্ষা চালানো হয় ভারতের বাছাই করা ২৮টি শহরে। প্রশ্ন ছিল, লোকসভার নির্বাচনে আপনি কংগ্রেস অথবা বিজেপি কোন দলকে ভোট দেবেন। মাত্র ২০ শতাংশ বলেছেন, কংগ্রেসকে এবং ৩২ শতাংশ বিজেপি-কে। সমীক্ষায় ৭৫ শতাংশই বলেছেন ভারতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় সমস্ত রাজনৈতিক দলই। কোনও দলই ধোয়া তুলসী পাতা নয়। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিই আর্থিক ও সামাজিক দুর্নীতির উৎস। তাই দলহীন নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবা যেতে পারে। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা না হয়েও আন্না হাজারে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। সুতরাং দলহীন সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা পরীক্ষামূলক ভাবে ভাবা যেতেই পারে।

মনমোহন সিং মন্ত্রিসভার মন্ত্রিদের ব্যক্তিগত যোগত্যা সম্পর্কে আস্থা রাখেন কী না জানতে চাইলে ৬৪ শতাংশ মানুষ 'না' বলেছেন। মতামতদাতাদের বক্তব্য, কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে অযোগ্য তার প্রমাণ রামলীলা ময়দানে পুলিশ পাঠিয়ে লাঠি চালিয়ে অনশন সত্যাগ্রহীদের হটিয়ে দেওয়া। লাঠি গুলি চালিয়ে দুর্নীতি বিরোধী গণ আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় না। সারা বিশ্বজুড়ে এর অজস্র উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও মনমোহনের অজমূর্খ মন্ত্রীরা সেই পথেই চলে ল্যাজে গোবরে হয়েছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রিকে তাঁরা অপদস্থ করেছেন। তাই আন্না হাজারেকে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাবের খসড়া রচনায় মনমোহন সিং তাঁর দলের মন্ত্রীদের উপর আস্থা রাখেননি। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপরেও নয়। দায়িত্ব দিয়েছেন বিজেপি-র আইনজীবী সাংসদ অরুণ জেটলিকে। এই ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কতটা অযোগ্য। জনমত সমীক্ষায় প্রশ্ন ছিল, আন্না বাবা রামদেবের অনশন সত্যাগ্রহের মোকাবিলায় চরম ব্যর্থতার পরে চলতি সেপ্টেম্বর মাসে যদি লোকসভার অকাল ভোট হয় এবং কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী আন্না হাজারে ভোটে দাঁড়ালে কাকে ভোট দেবেন? স্বাভাবিকভাবে ৭৮ শতাংশ বলেছেন তাঁরা আন্নাকেই ভোট দেবেন। মাত্র ১৭ শতাংশ রাহুলকে সমর্থন করার কথা বলেছেন। পাঁচ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা এখনও মনস্থির করতে পারেননি।

স্বীকার করছি এই জাতীয় সমীক্ষায় জনমত ১০০ শতাংশ নির্ভুলভাবে জানা যায় না। তবে একটা অভিমুখ পাওয়া যায়। যেমন, আন্না হাজারে এবং যোগগুরু বাবা রামদেবের দুর্নীতি বিরোধী অহিংস আন্দোলনের প্রভাব জনমনে কতটা পড়েছে তা অনুমান করা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না ভোটের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের রেটিং কমেছে। দল যতই চেষ্টা করুক না কেন সোনিয়া তনয় রাহুলের কেরিয়ারগ্রাফ মোটেই উজ্জ্বল নয়।

জনমত সমীক্ষার সময় ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন রাহুল গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নন।

পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স

ভোট আসে-যায়, ভোটাররা যে তিমিরে থাকেন সেই তিমিরেই থেকে যান। ভোটের পর পাঁচ বছর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এলাকায় আর মুখ না দেখালেও ভোটাররা নিরুপায়। পাঁচ বছর কিছুটি করার জো নেই, ভোটের সময় রাজনৈতিক নেতারা হয়ে যান সেই দাদাঠাকুরের কথায় 'ভোটের লাগিয়া, ভিখারী সাজিনু ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে।' ভোটের পর যে কে সেই। এহেন অবস্থাটা পাল্টাতে আন্না হাজারে দাবী করেছেন পছন্দ না হলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাচকদের তরফে প্রত্যাহার করার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। রে রে করে তেড়ে উঠেছেন কংগ্রেসী সাংসদরা। নিজের কবর কেউ নিজে এভাবে খুঁড়তে পারে? নেহাত অনশনের 'ব্ল্যাকমেলিং'টা রয়েছে নইলে এসব লোকায়ুক্ত-টুক্ত মার্কা পাগলামী কেউ মানে? তা বলে, আন্নার জন্য জনগণের কান্না শুনতে হবে? কংগ্রেসীরা কি এতটাই আহাম্মক! তবে আন্না হাজারের স্বস্তি এনে দিয়ে বিজেপি তাঁর দাবীকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে। অর্থাৎ নিজেদের কাজকর্মের ওপর বিজেপি সাংসদরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে, মেয়াদ ফুরোনোর আগেই যে কোনও সময়ে নির্বাচকমণ্ডলীর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন না তাঁরা। আন্নার এই দাবীর প্রতি সমর্থন এটাই বুঝিয়ে দিল যে বিজেপি আজও 'পার্টি উইথ অ্যা ডিফারেন্স'।

আফজল-কে বাঁচাতে

রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীদের দু'মাসের জন্য ফাঁসি রদ এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের অবিশ্বাস্য নীরবতা, সংসদ হামলা কান্ডে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী আফজল গুরুকে বাঁচানোর জন্য কংগ্রেসের ইঙ্গিত ধরে নিয়ে আফজলকে বাঁচাতে উঠে পড়ে লাগলো জম্মু-কাশ্মীর সরকার। আফজল গুরু-কে বাঁচাতে জম্মু-কাশ্মীরের বিধায়ক ইঞ্জিনিয়ার রশিদ তার ক্ষমাভিক্ষার একটি প্রস্তাব রাজ্য-সরকারের তরফ থেকে গত সেপ্টেম্বরে পেশ করেন। গত ৩১ আগস্ট এই বিষয়টি নিয়ে মারাত্মক টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি সরাসরি-ই মন্তব্য করেছেন— ''যদি জম্মু-কাশ্মীর সরকার আফজল গুরুর ব্যাপারে অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করায় (অর্থাৎ আফজল-কে ফাঁসি না দেবার সিদ্ধান্ত) তবে কি

সারা দেশ চুপ করে থাকবে? আমি মনে করি না।" তিনি বলতে চেয়েছেন, রাজীব হত্যাকারীদের মার্জনা করা হলে, আফজল কি দোষ করল? সুতরাং কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতোই তাদেরই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী'র হত্যাকারীদের ছেড়ে দিয়ে আফজল-কে বাঁচাতে চাইছে কংগ্রেস। ধন্য, মুসলিম ভোটের মায়া!

মহিলা সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান

দেশে মহিলা শিশুর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চিঠি পাঠিয়েছেন দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১১-এর প্রভিশনাল সেনসাস ডাটা থেকে ২০১১-এর চূড়ান্ত জনগণনা রিপোর্টে শূন্য থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারজন পুরুষে মহিলা'র সংখ্যা ৯২৭ থেকে কমে ৯১৪-য় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের অবিলম্বে এই ভয়াবহ সমস্যা মোকাবিলায় পরিকল্পনা তৈরি ও তা রূপায়ণের পরামর্শ দিয়েছেন। কেন্দ্র সরকার এই মহিলা সংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারটিকে ইতিমধ্যেই দেশের সামনে 'সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে।

বিদ্যুৎ সমস্যা

কয়লা-র ভাণ্ডারে কয়লা বাড়ন্ত। গ্যাস দিয়ে রান্নাটুকু যাও বা ম্যানেজ করা গেল কিন্তু বিদ্যুতের বিল দেখে মধ্যবিত্তের চক্ষু চড়কগাছ বললেও নেহাতই কম বলা হয়। বিকল্প শক্তির ব্যবস্থা হিসেবে ভরসা তাই সৌর বিদ্যুতেই। রাজ্যসভায় সম্প্রতি অপ্রচলিত শক্তিমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা ঘোষণা করেছেন, ২০১৩ সালের মধ্যেই সৌরবিদ্যুতের প্রতি ইউনিট এমন একটা পর্যায়ে এসে উন্নীত হবে যাতে প্রচলিত উপায়ে উৎপাদিত বিদ্যুতের ইউনিটের দামের সঙ্গে তফাৎ থাকবে না। উৎপাদন খরচটুকু বাদ দিলে সৌরবিদ্যুতের জন্য কাঁচামালের কোনও খরচ নেই। চাহিদা বাড়লে দামও কমে। তবুও আজ যে দামে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে মানুষকে সেই মাফিক-ই সৌরবিদ্যুৎ কিনতে হলে বিদ্যুৎ-সমস্যার সমাধান যে হয়েছে, তা অন্তত বলা যাবে না।

খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি

গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর যার যা কিছুই ক্ষতি করুক না কেন, এবার দেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতে বাগড়া দিয়েছে একথা কোনও অতি বড় নিন্দুকও বলতে পারবেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে বাজারে 'হট নিউজ' অবশ্যই 'হট প্রাইজ'। 'পকেট এবং 'বডি' যুগপৎ 'কোল্ড' হয়ে যাবার যোগাড়। খাদ্য-পণ্যের মুদ্রাস্ফীতিও থেমে নেই। ২০ আগস্ট সপ্তাহের শেষে ১০.০৫ শতাংশে পৌঁছয় খাদ্য-পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি। হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স (ডব্লিউ পি আই) অনুযায়ী তার আগের সপ্তাহে খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৯.৮০ শতাংশ। গত ৫ মাস আগেও এভাবে দু'অঙ্ক ছুঁয়েছিল মুদ্রাস্ফীতি। সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিয়ে পেরো-রেট বাড়িয়ে-কমিয়ে অর্থনীতির পুঁথির বুলি কপচিয়ে তা ম্যানেজ করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে 'এনফোর্সমেন্ট' দপ্তরের নজিরবিহীন গাফিলতিই খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তার পরিণতিতে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

তালিবান এল দেশে

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

কমপক্ষে আড়াই হাজার উগ্রপন্থী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে জেদাদের উৎসভূমিতে অপেক্ষা করছে। ভারতের ৬৫তম স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের সময় দেশের কোণায় কোণায় বিচ্ছিন্নতা ও বিস্ফোরণের আগুন জ্বালাতে, তাদের নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় তারা নিবিড় যোগাযোগ রেখেছে। দেশের ১২টি প্রধান বিমান বন্দরে জারি হয়েছিল সতর্ক বার্তা। ভাগ্য ভাল তেমন দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটেনি, কিন্তু ভারতের ভাগ্যলিপি থেকে ইসলামী সন্ত্রাসের আশঙ্কা আদৌ কাটেনি। বারংবার এই তালিবানি হুমকিতে সরকার হয়ত বিপর্যস্ত, কিন্তু দেশের সাধারণ জনগণ অপেক্ষা করছে পরবর্তী কোনও ১৩/৭, ২৬/১১, সংকটমোচন, শীতলাঘাট, অক্ষরধাম, আমেদাবাদ, গোধরা অথবা এমনই কোনও ভয়ংকর ভীতিপূর্ণ তালিবানি সন্ত্রাসের জন্য।

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জীতেন্দ্র প্রসাদ পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এবং কাশ্মীরের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে সংসদে যে বিবৃতি দিয়েছেন, যে কোনও সচেতন নাগরিকের কাছে তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সরকারের শেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তান পরিপুষ্ট জেহাদি প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ভারতের গণতন্ত্র, শান্তিশৃঙ্খলা এবং সভ্য সমাজকে শেষ করে দিতে বদ্ধপরিকর ২৫০০ তালিবানি জঙ্গি। এবছর এখনও পর্যন্ত ৫২টি জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৪৮৯ আর ২০০৯ সালে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে ৪৮৫ বার। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ২০০৮ সালে যেখানে ৭৭ বার আগ্নেয়াস্ত্র বিরতি বিধির লঙ্ঘন হয়েছিল তা ২০০৯ সালে ২৮ বার ঘটে। এই আগ্নেয়াস্ত্র বিরতি লঙ্ঘন করে ২০১০ সালে ৪৪ বার গোলা বর্ষণ হয়েছে। এ বছর জুলাই মাস পর্যন্ত এই আগ্নেয়াস্ত্র বিরতির লঙ্ঘন ঘটেছে ১৯ বার।

পরিসংখ্যান বলছে, জুন মাস পর্যন্ত যেখানে ২ জন জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয় তার সংখ্যাটা ২০০৮ সালে ছিল ৯০, ২০০৯ সালে ১০১ এবং ২০১০ সালে ১১২। আর সুরক্ষা বাহিনীর হাতে ২০০৮ সালে যেখানে ৬ জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে, সেখানে ২০০৯ সালে অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে ৯ জন। সেই সংখ্যা ২০১১ সালে সাংঘাতিকভাবে কমে মাত্র ১ জন।

এর থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাক প্রশিক্ষিত তালিবানি জঙ্গিরা ভারতে হানাদারির জন্য ক্রমশ তাদের তৎপরতা বাড়াচ্ছে। আর মানবাধিকার, রাজনৈতিক ডামাডোল ও দীর্ঘসূত্রতার নিস্পৃহ প্রশ্রয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতের অভ্যন্তরে তালিবানি প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে দ্রুত। যেখানে আরও কঠোরভাবে বহিরাগত শত্রুদের দমন করা সরকারের আবশ্যিক কর্তব্য হওয়া উচিত, সেখানে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বর্তমানে ৩ কোটি (সূত্র : দৈনিক জাগরণ, ৩ জুলাই, ২০১১)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গত ৩ বছর সরকার ৩ কোটি অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে মাত্র ৩ হাজার জনকেও

সরকারের এই ইসলামিক পক্ষপাতিত্বে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি কার্যকলাপ উভয়েই সংখ্যালঘু ভাবাবেগের সুরক্ষিত ঘেরাটোপে পরিপুষ্ট হয়েছে এক নিখাদ তালিবানি নৈসর্গিকতায়। সরকার নিয়োজিত কাশ্মীর বিষয়ক দুই মধ্যস্থতাকারী শ্রীমতী রাধা কুমার ও দিলীপ পদগাঁওকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুবই গুরুতর।

গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হননি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সামাজিক স্থিতি ও ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোহিত রায়ের মাধ্যমে ২০০৪ সালে পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত একটি গবেষণাপত্রে জানা যাচ্ছে, ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আনুমানিক সংখ্যা ১, ১৬,২২,৮৫০। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মাত্র ৭ বছরে ভারতে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, যখন সরকার ১৩/৭ অথবা মালেগাঁও কাণ্ডের ষড়যন্ত্র ভেদ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বাই বিস্ফোরণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত আমীর আজমল কাসভ, ২০০১ সালে সংসদ ভবন আক্রমণের জন্য মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত আফজল গুরু এবং ২০০০ সালের লালকেল্লা আক্রমণে ধৃত ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মহম্মদ আরিফ ওরফে আসফাককে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে তৎপর; তখন শুধুমাত্র সন্দেহভাজন হওয়ার কারণে স্বামী অসীমানন্দ এবং সাধ্বী প্রজ্ঞারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন কারান্তরালে অসম্ভবভাবে। মুসলমান সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে, সরকার ও হিন্দুবিরোধী পক্ষ যেভাবে 'হিন্দু কট্টরবাদ' বা 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদের' অলীক অবতারণা করেছে তাতে তালিবানপন্থীরা যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছে।

সরকারের এই ইসলামিক পক্ষপাতিত্বে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি কার্যকলাপ উভয়েই সংখ্যালঘু ভাবাবেগের সুরক্ষিত ঘেরাটোপে পরিপুষ্ট হয়েছে এক নিখাদ তালিবানি নৈসর্গিকতায়। সরকার নিয়োজিত কাশ্মীর বিষয়ক দুই মধ্যস্থতাকারী শ্রীমতী রাধা কুমার ও দিলীপ পদগাঁওকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুবই গুরুতর। গত দু' দশক করে খোদ আমেরিকার বুকে ঘাঁটি গেড়ে ভারতের কাশ্মীর নীতি বানচাল করে কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ৪ মিলিয়ন ডলারের পাকিস্তানী সাহায্যপুষ্ট গুলাম নবী ফাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এঁরা। পাকপন্থী আই এস আই লবির চক্রান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য গত ২৫ বছর ধরে আমেরিকার বুকে 'কাশ্মীর আমেরিকান কাউন্সিল' পরিচালনা করেছিলেন কুখ্যাত এই গুলাম নবী ফাই। আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনী এফ বি আই-এর ফাঁদে ধরা পড়ার পর এখন জানা যাচ্ছে, মধ্যপন্থী হুরিয়ত নেতা মিরওয়াইজ ফারুক, কট্টরপন্থী আলি শাহ গিলানী সহ, এই ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘু অধিকারের প্রাণপুরুষ বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার থেকে অনেক বড় বড় মানবাধিকার, প্রচার মাধ্যম এবং সুশীল সমাজের বহু হোমরা-চোমরা গুলাম নবি ফাই-এর আতিথেয়তায় ভরপুর হয়েছেন। আর নুন খেয়ে কাশ্মীর স্বাধীনতার পক্ষে আর তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের গানও গাইতে হয়েছে তাদের। প্রখ্যাত সাংবাদিক সন্ধ্যা জৈন তাঁর সাম্প্রতিক আলোচনায় দেখিয়েছেন কিভাবে 'এফ বি আই'-'ফাই'-'আই এস আই'-'কংগ্রেস' চক্রের অভ্যন্তরে ভারত-বিরোধী নীতি পল্লবিত হয়েছে। গুলাম নবির ফাইয়ের শ্রীঘর বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যকারী ভারতীয় বন্ধুদেরও একই শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।

সম্প্রতি ভারতে তালিবানি শাসনের পদক্ষেপ হিসাবে ভূপালের চকবাজারে ছোটোখাটো এক তালিবানি মহড়া সম্পন্ন হলো। ভূপাল শহরের মুফ্‌তি কাজি সৈয়দ ফাজিল কাসমি ফতোয়া জারি করেছিলেন

যে, ''ঈদের বাজারে মেয়েরা কখনওই 'একলা' বা 'বেপর্দা' হয়ে বাজার করতে পারবে না''। এই নির্দেশে তালিবানিপন্থায় উৎসাহিত মুসলমান যুবকেরা বাজারের অলিতে-গলিতে ফেস্টুন টাঙিয়ে লিখে দেয় যে ''ঘরই হলো মহিলাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গা''। উৎসাহিত তালিবানি যুবকেরা দোকান ভাঙচুর শুরু করলে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা পুলিশে খবর দেয়। তার আগে ওই উন্মত্ত যুবকেরা কাঁচি দিয়ে নতুন কাপড় টুকরো করে, কাঁচ ভেঙ্গে তাণ্ডবের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পুলিশ এসে ঘটনার নিয়ন্ত্রণ করলেও এক অজানা নির্দেশনায় কোনও ভূপালী তালিবানিকেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। আসলে ওই ইমাম ও তাঁর সমর্থকরা হয়ত ভেবেছিলেন ভূপাল শহরটি আফগানিস্তানেরই এক অংশ এবং জেহাদের এক প্রকৃষ্ট ভূমি। তালিবানিরা ভারতের কাশ্মীর-আসাম-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাসহ বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় শরিয়তি (পড়ুন তালিবানি) শাসন কায়েম করতে চাইছে। যেখানে প্রস্তুতি চলছে মেয়েদেরকে স্কুলে যেতে না দেওয়া, অবশ্যিকভাবে 'হিজাব' ও 'বোরখা' পরিধান, মহিলা লিঙ্গত্বক (কামাদ্রি) ছেদ, সম্মান হত্যা ইত্যাদি বাস্তবায়নের। এসব নিয়ে এক নিটোল তালিবানি সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ভারতীয় মোল্লা-মৌলবীদের চেষ্টার অন্ত নেই।

ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানের বাতাস আমেরিকার সৈন্যদের সামনে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত কতকগুলো 'সত্য' / 'মিথ্যা' অভিযানের মাধ্যমে ওসামা বিন লাদেন, হাক্কানি অথবা ইলিয়াস কাশ্মীরীদের গায়েব করে কিংবা পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে 'দ্রোণ' বিমান আক্রমণের মাধ্যমে এই তালিবানি জেহাদকে রোখা যাবে না। শুধুমাত্র লাদেন, বায়তুল্লা মেহস্মুদ, হাক্কানি অথবা ইলিয়াস কাশ্মীরীদের নাম তালিবানি যোদ্ধাদের কাছে তাদের অস্তিত্বের থেকেও অনেক। আর নিশ্চিন্তভাবেই মাত্র ৫ বছরের মধ্যে এ সমস্ত নেতৃত্বের ভারতকে তালিবানি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সাধারণ কর্মসূচী রয়েছে।

এখন শুধুমাত্র এই তালিবানি নির্দেশনা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভারতে ধর্মান্ধ মুসলমানরা অমুসলিমদের উপরেও শরিয়ত চাপিয়ে দেওয়ার এক সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত। ভারতে স্বাধীনতার পর মুসলমানের সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (১৯৪৭ সালে মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৩.৫ কোটি, বর্তমানে তা প্রায় ১৭.৫ কোটি) এবং তা সম্ভব হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি, অনুপ্রবেশ, গণধর্মান্তরকরণ, 'লাভ জেহাদ', সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নির্বিচারে হিন্দুহত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে। এখন ভারতীয় তালিবানদের পরিকল্পনা— হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যেমন করে হোক শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। সম্প্রতি বিখ্যাত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দার-উল-উলুম-দেওবন্দ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত 'তেহেরিক-ই-তালিবান- হিন্দুস্তান' নামে একটি সংগঠনের ছাত্ররা 'ইন্টারনেট'-এর মাধ্যমে এক ভয়ংকর হুমকি দিয়েছে। হুমকিটি নিম্নরূপ :—

''এই দেশ ভারত কোনওকালেই হিন্দুদের রাষ্ট্র ছিল না। হাজার বছর ধরে এই দেশ মুসলমানদের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়েছে। আমরা 'তেহেরিক-ই-তালিবানের' ছাত্ররা দাবি করছি যে, সমস্ত মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় একমাত্র শরিয়তি আইনই প্রযুক্ত হবে।

সেহেতু আমরা এই আদেশ সমস্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য পাঠাচ্ছি যে, মুসলমানদের অধীনে বাঁচার এবং কাজের অধিকারের জন্য তাদের অবশ্যই জিজিয়া কর দেওয়া শুরু করতে হবে।

তোমাদের জন্য মাত্র তিনটি বিকল্প রয়েছে।

১। আমাদের মহান আদর্শ ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা সুরক্ষিত থাকবে।

২। অথবা, আমাদের নিয়ম-কানুন মোতাবেক 'জিজিয়া কর' দাও এবং বেঁচে থাক।

৩। অথবা, আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

প্রতিমাসের ১ তারিখে স্থানীয় মসজিদে অবশ্যই তোমাদের আয়ের ১০ শতাংশ জমা কর। বিষয়টি লঙ্ঘন করলে অথবা এই নির্দেশকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করলে তার ফল হবে কঠোর এবং মারাত্মক শাস্তি। এবং তা বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধের প্ররোচনা হিসাবে গৃহীত হবে।

ইন্‌সাআল্লা আমরা নিশ্চিতভাবে সেই পথই অবলম্বন করব যা তোমরা কখনই ধারণা করতে পারবে না।

দার-উল-উলুম, দেওবন্দ, ভারত।

আপনারা নিম্নোক্ত E-mail, Phone এবং Fax-এ যোগাযোগ করতে পারেন— E-mail Id- info@darululumdeoband.com ফোন- ৯১-১৩৩৫-২২২৪২৯

ফ্যাক্স-৯১-১৩৩৬-২২২৭৬৮''।

এই ধরনের ঘৃণার প্রচারের সাংঘাতিক ফল অনুমান করে, বর্তমান লেখক বিষয়টির সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে E-mail এর মাধ্যমে দার-উল-উলুম-দেওবন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে দেওবন্দের নিস্পৃহতা ও অবহেলা ছিল চূড়ান্ত। যদিও তারা উপর্যুপরি অনুরোধের পর প্রত্যুত্তর দেন নিম্নোক্ত বয়ানে—''প্রিয় উপানন্দ ব্রহ্মচারী, অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা। আপনার E-mail-এর পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমরা এই ধরনের আন্দোলনের বিষয়ে অবগত নই। এই তথাকথিত আন্দোলনের সঙ্গে দার-উল-উলুম- দেওবন্দের কোনও সম্পর্ক নেই বা ওই আন্দোলনের আদর্শবাদকে দেওবন্দ সমর্থন করে না। দারউল-উলুম-দেওবন্দ শান্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাসী। (মৌলানা মুফতি) আবুল কাসিম নোমানি, কার্যকরী মহতামিন, দার-উল-উলুম-দেওবন্দ।''

এটুকু উত্তর পাওয়ার জন্য এই লেখককে বারংবার চেষ্টা চালাতে হয়েছে। উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত দেওবন্দ এই 'সত্য' অথবা 'জাল' তেহেরিক-ই হিন্দুস্তানের দ্বারা হিন্দু বিরোধী বিদ্বেষ প্রচারের উৎস কি তা তাঁরা জানতে চেষ্টা করেননি। এমনকি এই দুষ্কর্মের জন্য কারোর বিরুদ্ধেই 'দার-উল-উলুম-দেওবন্দের নাম' এভাবে ব্যবহারের জন্য কোনও অভিযোগ বা এফ আই আর করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাসদমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার, তবলীগ (ধর্মপ্রচার দল), ইজতেমা (ধর্মসম্মেলন), স্থানীয় কাজির (শরিয়তি) আদালত, মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মুসলিম রাজনৈতিক দল (অবশ্য ভোটব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে সব রাজনৈতিক দল), সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, হিজবুল, হুরিয়তের মতো জেহাদী গোষ্ঠী এবং আই এস আই-ডি জি এফ আই-এর যৌথ নেটওয়ার্ক এবং ভারতে সর্বত্র উপস্থিত পঞ্চমবাহিনী— সকলের সান্নিধ্যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের শেষ সীমা নির্ণয় হচ্ছে।

আর শুরু হচ্ছে তালিবানি যুগ আরম্ভের শূন্যাভিমুখী সময় গণনা। ভারতে অজস্র মিনি পাকিস্তান ও ইসলামী চাঁদ তারা পতাকা যুক্ত এলাকাগুলিতে তালিবানি পদচিহ্ন খুঁজে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। লম্বা দাড়ি, মুসলিম টুপি, লম্বা ঝুলের কুর্তা, বেশ খাটো পাজামা, আষ্টেপৃষ্টে আটকানো বোরখা, পুনর্নির্মিত ঝাঁ-চকচকে মসজিদ, উচ্চগ্রামে মসজিদের মিনার থেকে পাঁচ ওয়াক্তের নিয়মানুবর্তী আজান, জুম্মাবারে রাস্তা দখল করে নামাজ, এলাকায় এলাকায় খোলা গোমাংসের দোকান ও মুসলিম হোটেল, ২৪×৭ সময়ের সরগরম ক্লাব, প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা, ইফতার আর মিলাদ-উন-নবীর অছিলায় সর্বদলীয় (রাজনৈতিক) বৈঠক, সরকারি অফিসে সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষায় নতুন বিভাগ, মুসলিম ঋণদানের জন্য বিশেষ শিবির, কোথাও কোথাও ইসলামিক ব্যাঙ্ক আর অবশ্যই 'আল্লাহ-র সবচেয়ে প্রিয় কাজ জেহাদের' জন্য হঠাৎ করে কিছু যুবকের এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া—এসবই ভারতে তালিবানি বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করতে চায়।

এবার হয়ত বাঙালীর কাছে একদা ভয়াল প্রবাদ বাক্য 'বর্গী এল দেশে' পাল্টে যাবে। তখন হয়ত বলা হবে 'তালিবান এল দেশে।'

একথা যদি আপনি না মানতে চান, তবে পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য অনেক বড় পদক্ষেপ নিতে হবে।

গণমাধ্যম এখন প্রচার-প্রিয় এবং আয়-লোলুপ

অতিথি কলম

নারদ

ব্যাপারটা যেন পাহারাদারকেই পাহারা। গণমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের প্রহরী। এখন দেশের গণমাধ্যমগুলো যে ভূমিকা নিচ্ছে তাতে তাদেরই উপর নজরদারি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের হালফিল ছবিটা তুলে ধরা হয়েছে ১২ আগস্টের 'ফ্রন্টলাইন' পাক্ষিক পত্রে। অত্যন্ত জোরালো একটি নিবন্ধ লিখেছেন সাংবাদিক পরাঞ্জয় গুহঠাকুরতা ও অ্যালিস সীব্রাইট। বলা হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যম কীভাবে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে দেশের নানা মহলে। স্টার গোষ্ঠীর চ্যানেলগুলো খুব খারাপ ভূমিকা নিয়েছে। তারা গুরুত্ব দিয়েছে যৌনতা আর বিখ্যাত মানুষদের উপর। সহজভঙ্গিতে বলা যায় সেক্স আর সেলিব্রিটি। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে ইংরেজি সি আদ্যক্ষর দিয়ে তিন জিনিস— ক্রাইম, ক্রিকেট, সিনেমা। সাংবাদিকতা বেশ মজার জায়গায় পৌঁছেছে। কারও কারও মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এত প্রচার করা হচ্ছে যাদের ছবি ছেপে তারা কারা? কি উদ্দেশ্য? এই প্রচার হচ্ছে কি অর্থের বিনিময়ে? যদি তাই-ই হয়, তাহলে টাকা জোগাচ্ছে কে? তথাকথিত খ্যাতিমানরাই চুপিচুপি টাকা দিয়ে নিজেদের কীর্তন প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন? না, কেউ ভালো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করছে যোগ দেওয়ার জন্যে? এসব ব্যাপার নিয়ে কি সরকারি তরফ থেকে তদন্ত হতে পারে না? কলকাতার একটি দৈনিক প্রায় অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড করেছে। একদিনের কাগজে ১৯ জন যুবতীর ছবি ছাপা হয়েছে। যাদের পরনে বিকিনি অর্থাৎ দুখণ্ড দেহাবরণ। সম্পাদকের অঙ্ক পরিষ্কার, এমন ছবি ছাপলে ভালো জনসংযোগ হবে। কাগজের ভালো চাহিদা থাকবে। গুহঠাকুরতা ও সীব্রাইট এই উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যাপারগুলোর উল্লেখ করে বলেছেন, এসব ভালোমতো মদত পাচ্ছে, বিশেষ করে টেলিভিশন মাধ্যমে।

কিছুকাল আগে সুব্রমনিয়াম স্বামীর একটা লেখা ছাপা হয়েছিল 'দি নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-পত্রিকায়। তার মধ্যে উগ্র অসহিষ্ণু ভাবনার প্রকাশ ছিল। বিভিন্ন স্তর থেকে দাবি উঠেছিল তাঁকে গ্রেপ্তারের। স্বামী হয়তো সাংবাদিকতার লক্ষণ-রেখা বা বিধিনিয়মের গণ্ডি কিছুটা পেরিয়েছিলেন। এবং তার দরুন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কঠোর সমালোচনা করেন। একটা টেলিভিশন চ্যানেল সি এন এন-আই বি এন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটা সমীক্ষা নিয়ে যাচাই করার চেষ্টা চালায় কত শতাংশ লোক সুব্রমনিয়াম স্বামীর মতে সায় দিচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার ব্যাপার লোকজন এখন মুম্বাইয়ে ও অন্যত্র একের পর এক জঙ্গি আক্রমণে বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত। এ সময়ে স্বামীর কথাকে হয় নিন্দে করতে হয়, নয়তো উপেক্ষা করতে হয়। তৃতীয় পথ নেই। তাতে আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার ব্যাপারটা পাত্তা পাবে না। অবস্থাটা যেন এমনই সুব্রমনিয়াম স্বামী কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। গণমাধ্যম নিজেরাই ঠিক করেছে কীরকম প্রচার হবে, কোনটা এড়াতে হবে। সবই চলেছে দ্রুততায় এবং ভুল পদ্ধতিতে।

অনেকের মনে আছে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কথাটা, 'গণমাধ্যম ক্ষুধার্ত বুনো জন্তুর মতো উদগ্র অসংযত আক্রমণ চালায়।' একটা প্রবণতা প্রবল যার কোন পটভূমি নেই, সূত্র ছাড়াই খবর ছাপা হচ্ছে। ওইরকম উদ্দেশ্যমূলক খবর ছাপা চলতি সময়ের রীতি। প্রাবন্ধিক পরাঞ্জয় গুহঠাকুরতা উল্লেখ করেছেন, টিভি টুডে গোষ্ঠীর আজতক নতুন চ্যানেল করেছে 'তেজ' নামে। 'তেজ'-এর মানে হলো দ্রুত। খবরের প্রচারেই বলা হচ্ছে : খবর ফটাফট অর্থাৎ ঝটিতিবার্তা। ঝটিতিবার্তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জরুরি। কারণ তা শুধু শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করে না, ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। অসংখ্য চ্যানেল শুধু চমক লাগানোর জন্যে ব্যস্ত। তাদের খবর যাচাই করার মেধা, ক্ষমতা, সময় কোথায়? অভাব দায়িত্বের। এসব কি বার বার শেখাতে হবে? একটা জিনিস প্রচারের সময় মনে রাখা দরকার তা শ্রোতাদের মনে হিংসা বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দেবে না তো, পারস্পরিক ঘৃণার জন্ম দেবে না তো?

১৮ জুলাই 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' সিকি পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন ছেপেছে মাতৃভূমি পত্রিকার। এই মালয়ালাম পত্রিকা নিজস্ব ঘরানায় চলে। দাবি করেছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার নতুন গ্রাহক পেয়েছে গত তিনমাসে। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা এরকম : 'মাতৃভূমির প্রচার কুড়িগুণ বেড়েছে— পত্রিকার কাছাকাছি যে প্রতিযোগী কাগজ আছে তার প্রচার ছাড়িয়ে মাতৃভূমি এখন পৌঁছেছে ৬৮ লক্ষ পাঠকের কাছে।' সত্যি বলতে কী, এরকম পাঠক- সমাদর কোনও পত্রিকা পেলে তা গর্বের ব্যাপার। কেরল অবশ্যই গর্ব করতে পারে। দেশের সাক্ষরতার মানচিত্রে শীর্ষে থাকা এই রাজ্যের পাঠকরা নিয়মিত পড়ছেন। ওই রাজ্যে বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা আসছে, কারণ সেখানকার বহু মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কাজ করে টাকা দেশে পাঠান। সাধারণ মানুষের মাথা পিছু আয় বেড়েছে অনেক, যা সারা দেশের মাপকাঠিতে সবচেয়ে বেশি। 'মাতৃভূমি' এককভাবে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারে।

'ভারতীয় পাঠক সমীক্ষা ২০১০' শিরোনামে এক প্রতিবেদন পেশ করেছে 'দি মিডিয়া রিসার্চ ইউজারস কাউনসিল'। তাতে ভারতের বিভিন্ন দৈনিকের অগ্রগতির খতিয়ান রয়েছে। হিন্দি খবরের কাগজ 'দৈনিক জাগরণ' এই পাঠক-সমীক্ষার প্রতিবেদনে শীর্ষে আছে। এই কাগজের পাঠক ১৬ লক্ষ ৬৬ হাজার। পাঠক-সমাদৃত আরও দুটি দৈনিকের নাম রয়েছে— দৈনিক ভাস্কর ও হিন্দুস্থান। দৈনিক ভাস্কর-এর বিক্রি ১৩,৯৫০,০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩,৯৫২,০০। একই সঙ্গে বেড়েছে হিন্দুস্থান-এর বিক্রি। ১০,৮৩৯,০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১,৪৫২,০০। মালয়ালাম মনোরমা বিক্রির শীর্ষে ছিল একসময়। এখন তার চাহিদা একটু কমেছে। তবে এখনও বিক্রির হিসেবে দেশের চতুর্থ পত্রিকা। যার বিক্রি ৯,৯৩০,০০ কপি। এসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে 'অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান রিডারশিপ' সমীক্ষা থেকে। অমর উজালার বিক্রি এখন ৮,৬৪০,০০ কপি। মারাঠি দৈনিক লোকমত-এর প্রতিদিন বিক্রি ৭,৭১২,০০। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার চাহিদা ৭,৪২৪,০০। অর্থাৎ সপ্তম স্থান। এসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে দি প্রেস ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়ার মুখপত্র 'বিদুর'-এর এপ্রিল-জুন সংখ্যা থেকে। বোঝাই যাচ্ছে হিন্দি দৈনিকগুলো দেশের সংবাদপত্র পাঠকদের বড় অংশকে দখল করেছে।

মজার ব্যাপার হলো, তিনটি কানাড়া ভাষার দৈনিক 'বিজয় কানাড়া, প্রাচ্যবাণী, কন্নড়প্রভা কাগজগুলোর প্রচার বেড়েছে। আমেদাবাদের কাগজ 'সন্দেশ'-এর ১৬ পৃষ্ঠার থ্রিডি সংস্করণ বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র পড়ার জন্যে পাঠকদের বিশেষ ধরনের চশমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমাদের জাতীয় স্তরের দৈনিকগুলোর অগ্রগতি যাই-ই হোক না কেন এদের অধিকাংশ খবর ছাপার বিনিময়ে অর্থ নিয়েছে— এটা সত্যি ঘটনা। মিডিয়া সার্টিফিকেশন মনিটরি কমিটি কড়া নজর রাখছে কাগজে প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপন ও রাজনৈতিক খবরের উপর। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় টাকা নিয়ে খবর ছাপা হয়েছে কিনা লক্ষ্য করছে। প্রেস ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের উপর।

রাতের সীমান্ত : ওঁৎ পাতা বিপদ

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

সে রাত্রে আকাশটা ছিল পরিষ্কার। আকাশে যেন তারার মেলা বসেছে। মিল্কিওয়ে ছায়াপথটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নীচে গহন অন্ধকার। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। দু-একটা পাখির ডানার ঝটপটানি। মাঝে মাঝে কোনও ভীত সন্ত্রস্ত পাখির কর্কশ আওয়াজ সেই নিস্তব্ধটাকে খানখান করে ভেঙ্গে দিচ্ছে। আকাশে চিরাচরিত মেঘের কোনও দেখা নেই। সৈনিকের দৃষ্টি সামনের দিকে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, পাতার খসখসানি। সৈনিক তাঁর নাইট ভিশন গগলস্‌টা ব্যবহার করছে, কোনও শত্রু পক্ষ কি চুপিসাড়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে? গ্রীষ্মের এই নিস্তব্ধ রাত্রেও যেন ঠাণ্ডাটা বেশ চেপে বসেছে। কোট-পারখাও যেন ঠাণ্ডার আমেজকে রোধ করতে পারছে না। পারবে কি করে? সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চতায় কাশ্মীরের গ্রীষ্মও সমতলের শীতকালের সমান। কাশ্মীর সীমান্তের দুটি কাঁটার মাঝখানে জনাদশেক সৈনিক মধ্যরাত্রে নজরদারিতে ব্যস্ত। অনুপ্রবেশকারীরা এখন রাত্রিকেই ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করার জন্য বেছে নেয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনও মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে না। চোখের ওই গগলস্‌টা যেদিকে পড়ছে, অনেকটা দূরত্ব পর্যন্ত দিনের বেলার মতো দেখা যাচ্ছে। কোন মানুষ নয়, হয়তো মৃদুমন্দ বাতাসে পাতার খসখসানি অথবা কোনও জন্তুর চলাফেরা। সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনও সন্ত্রাসবাদী সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছে না। দলনেতার ইশারায়, একে একে সবাই উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে বলা হলো সবাই প্রস্তুত। আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পেট্রোল সামনের দিকে। ঘণ্টাখানেক চলার পর আবার সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। আকাশের তারার চাঁদনী কোথায় হারিয়ে নিয়েছে। কোথা থেকে পুঞ্জিভূত মেঘ উড়ে এসে আকাশটা প্রায় ঢেকে দিয়েছে। আবার সেই একই প্রক্রিয়া। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে নজরদারি করতে হবে। ঝিরঝির করে নিঃশব্দে পেঁজা তুলার মতো তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদাচাদরে চতুর্দিক ঢেকে গেল। পাইন গাছের পাতার উপরও সাদার ছাউনি। রাত্রে দেখার গগলস্‌ দিয়েও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। তুষার পাতের সময় বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সামনে যেন একটা সাদা পর্দা। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেলে আবার অন্ধকারেও অনেকদূর অনেক কিছু দেখা যায়। সৈনিক দল প্রতীক্ষারত।

জলঙ্গী থেকে ফারাক্কা, এই ১৩৪ কিলোমিটার সীমান্তে কোনও কাঁটাতারের বেড়াও নেই। এই সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্র মুর্শিদাবাদ থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে সব অস্ত্র-ই যে এসেছে বাংলাদেশ থেকে তা নয়। সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের বেশকিছু গ্রামের গোয়ালঘরে এবং বাড়ির গোপন কুঠুরিতে গড়ে ওঠা অস্ত্র কারখানাও এই সরবরাহের উৎস।

এই পরিবেশের সুযোগ নিয়ে লস্কর-ই-তৈবা অথবা অন্য কোনও জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের প্রয়াস চালাবে নাকি? সৈনিকরা সামনে পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কোথাও কোন চলাফেরার, নড়াচড়ার আভাস আসছে কি? সত্যিই ৩০-৪০ গজ দূরে একটি মানুষের শরীর নিঃশব্দে উঠে আসছে। হয়তো বুকে হেঁটে আসছে। তার শরীরটাও বরফে ঢাকা। একটু অপেক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করছে, কোথাও কোনও প্রহরী আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। পিছনে ইশারা করে সে এগিয়ে আসছে। সামনে মাটিতে বুক পেতে প্রতীক্ষারত ভারতীয় সৈনিকদের সে মনে হয় দেখতে পায়নি। একজন সৈনিক উঁচুগলায় বলল, ''দাঁড়াও। হাত উপরে কর, অন্যথায় গুলি চালাব।'' উত্তরে এ কে ৪৭ এর এক ঝাঁক গুলি কট্‌ কট্‌ আওয়াজ করে ছুটে এল। আওয়াজ পাওয়া গেল কিছু সন্ত্রাসী নীচের দিকে ছুটে গেল। জওয়ান দুটি গুলি চালাল, কিন্তু কেউ হতাহত হলো বলে মনে হলো না। এ কে ৪৭ এর গুলিও যেন ভারতীয় সৈনিকদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কারও আঘাত লেগেছে বলে মনে হলো না। দলের অধিনায়ক, সৈনিকদের ৩০০ গজ ডানদিকে চলবার আদেশ দিল। দু'জন সেখানেই রইল যদি অনুপ্রবেশকারীরা আবার ওই অঞ্চলে এগিয়ে আসে। কিন্তু দলনায়ক কেন ৩০০ গজ দূরে যাওয়ার আদেশ দিল? তার উত্তর পাওয়া গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। পাকিস্তানের দিক থেকে ওই অঞ্চলে গোলাবৃষ্টি অতবেশী কার্যকরী হয় না। কিন্তু সামান্য বরফে অথবা বরফ গলে যাওয়ার পর গোলার আঘাত মারাত্মক হয়ে ওঠে। ৩০০ গজ দূরে পৌঁছোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ভারতভূখণ্ডে

প্রবেশ করছে। রিজলাইনে তাদের দেখা যাচ্ছে। এপার থেকে অন্তত দশটি রাইফেল গর্জে উঠল। সৈনিকরা দ্রুত পারাপারের জায়গায় পৌঁছে গেল। নরম বরফের উপর তাদের পদচিহ্ন পরিষ্কার। অল্প অল্প তুষারপাত তখনও হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই পদচিহ্নগুলি বরফে ঢেকে যাবে। দলনায়ক দু-জন সৈনিককে ওই জায়গায় পাহারায় রেখে ওই পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে অগ্রসর হলো। কিছুদূরেই ঘন জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। পদচিহ্ন সেই জঙ্গলের দিকেই গিয়েছে। দলনায়ক জানে যে কোনও মুহূর্তে, ওই দিক থেকে এ কে ৪৭-এর গুলি ছুটে আসতে পারে ঝাঁকে ঝাঁকে। ''জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন''। সেই চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে দলনেতা এগিয়ে চলে জঙ্গলের ভিতরে। ইতিমধ্যে সে তার ঘাঁটির কম্যান্ডারকে সব তথ্য জানিয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের পিছনে একটা ছোট গ্রাম রয়েছে। হয়তো, সন্ত্রাসবাদীরা ওই গ্রামের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। ঘাঁটি কম্যান্ডার আর একটা পেট্রোল (নজরদারি দল) পাঠিয়ে দিল, গ্রামে প্রবেশের পথ বন্ধ করতে। জঙ্গলের ভিতরে কিন্তু ঘন অন্ধকার। পদচিহ্নও আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে আবার এ কে ৪৭ গর্জে উঠল। এবার এক জওয়ানের হাতে বুলেটের আঘাত লেগেছে। সে মাটিতে ঢলে পড়েছে। গুলির উৎস লক্ষ্য করে এদিক থেকেও কয়েকটি রাইফেল গর্জে উঠল। মোবাইলে খবর এল গুলি চালিও না। সন্ত্রাসবাদীরা গ্রামে ঢুকেছে। আমরা গ্রামটিকে ঘেরার প্রয়াস করছি। সীমান্তের কাছে গ্রামগুলি খুবই ছোট, ২০-২৫টি ঘর। তোমরা সাবধানে জঙ্গলটি খুঁজে দেখ, কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। ঘাঁটি থেকে আরও সৈন্য আসছে। দলনায়ক সবাইকে ডেকে নিল। সীমান্তে বসে থাকার আর প্রয়োজন নেই। তখনও পাকিস্তান পোস্ট থেকে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। সবাই এসে যাওয়ার পর আহত জওয়ানটিকে কাঁধে করে নিয়ে আসা হয়েছে। তার ক্ষতের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। গুলিটি হাতের মধ্যে রয়েছে অথবা মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। বোঝার উপায় নেই। একমাত্র প্রচেষ্টা রক্তক্ষরণ বন্ধ করা। পাহাড় জঙ্গলের ভিতরে একজন আহত জওয়ানকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া যে কত কঠিন! যে এমতাবস্থায় না পড়েছে, সে কোনওদিনই অনুধাবন করতে পারবে না। ভারতের সামরিকবাহিনীতে বহু বিভাগ আছে। যেমন, সাঁজোয়াবাহিনী (ট্যাঙ্ক), ইঞ্জিনিয়ার, সিগন্যাল, সাপ্লাই কোর, অর্ডিন্যান্স কোর ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র পদাতিক বাহিনীর অফিসার আর জওয়ানরাই এইসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করে থাকে। যে অফিসার, সে যতবড় অফিসারই হোন, যদি ২৫-৩০ কেজি ওজন পিঠে নিয়ে ১২০০০—১৪০০০ ফুট উচ্চতায় লড়াই না করে থাকেন, তিনি কোনওদিনই অনুধাবন করতে পারবেন না 'কত ধানে কত চাল'। প্রতিরক্ষা বিভাগের বাবুরা অথবা অন্য কেউই জানবেন না পদাতিক বাহিনী কীভাবে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, আই এস আই এবং জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

সৈন্যদল পৌঁছেছে সেই গ্রামের প্রান্তে। আহত জওয়ানকে স্ট্রেচারে শুইয়ে এবার নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাকে একদল নিয়ে চলে গেল। বাকিরা ওই গ্রামটিকে ঘিরে রাখল। কোনও-না-কোনও বাড়িতে সন্ত্রাসবাদীরা প্রবেশ করেছে। আগামীকাল দিবালোকে তাদের খোঁজার প্রয়াস হবে। রাত্রির অন্ধকার কেটে পুবে আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে। রাত্রের সীমান্তের অপারেশন শেষ, এবার দিনের অপারেশন আরম্ভ হবে।

চলুন এবার দেখি ঘরের কাছে আর এক রাতের সীমান্ত। মুর্শিদকুলী খাঁর বহু আদরের এই জেলা। অধুনা বাংলাদেশ সীমান্ত। এই সীমান্তে কোনও সামরিক বাহিনী নেই। দায়িত্ব সীমা সুরক্ষা বলের।

জলঙ্গী থেকে ফারাক্কা, এই ১৩৪ কিলোমিটার সীমান্তে কোনও কাঁটাতারের বেড়াও নেই। এই সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্র মুর্শিদাবাদ থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে সব অস্ত্র-ই যে এসেছে বাংলাদেশ থেকে তা নয়। সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের বেশকিছু গ্রামের গোয়ালঘরে এবং বাড়ির গোপন কুঠুরিতে গড়ে ওঠা অস্ত্র কারখানাও এই সরবরাহের উৎস। অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করে মোটা টাকার বিনিময়ে তা অনায়াসে সরবরাহ করা হচ্ছে। পাকিস্তান সীমান্তের মতোই উদ্বেগজনক অবস্থা বাংলাদেশ সীমান্তে। শেখ হাসিনার প্রশাসনে চোরাচালান কিছুটা কমলেও এই সীমান্ত জঙ্গিরা নীরবে ব্যবহার করছে অনুপ্রবেশ ও যাতায়াতের করিডর হিসাবে। পাক-গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই অন্ততঃ ১৩০টি জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছে। তাদের উদ্দেশ্য মুর্শিদাবাদে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটানো। হাসিনা সরকারের ক্ষমতায় আসার আগে মুর্শিদাবাদে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের স্থান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই এই সীমান্ত কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। এপার থেকে শত শত গোরু বের করে ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামগুলির প্রধান পেশা চোরাচালান। পাকিস্তানের নোট তৈরির কারখানায় কোটি কোটি টাকার ভারতীয় জাল নোট ছাপা হচ্ছে এবং এই সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। রানীনগর থানার বাহারপাড়া বর্ডার আউট পোস্ট, লালগোলার খান্দুয়া বর্ডার আউট পোস্ট জাল নোট পাচারের প্রধান পথ। জলঙ্গী, বাহারপাড়া, রাজাপুর, ঘোষপাড়া, কাতলামারী বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে। লালগোলার কাটাখালি, কৃষ্ণখাল, রামনগর, তারানগর, দেশোয়ালীপাড়া, আগরতলা, পুরপুলিতলা, আড়িয়াদহ ইত্যাদি এলাকা দিয়ে চোরাই মাল পাচার হয়। এই দীর্ঘ সীমান্ত সম্পূর্ণভাবে নজরদারিতে রাখা সহজ নয়। সীমান্ত সুরক্ষা বলের বিরুদ্ধেও ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। বহু সংখ্যক নৌকা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এত অনুপ্রবেশ, এত চোরাচালান?

প্রায় মাঝরাতে নৌকায় সীমা সুরক্ষা বলের কর্মীরা প্রহরায় বসে রয়েছেন। রাতের অন্ধকারেও দূর থেকে দেখা গেল কিছু মানুষ ওপার থেকে এপারে প্রবেশ করছেন। সঙ্গে সঙ্গেই কর্মীরা ছুটলেন তাদের ধরতে। অনুপ্রবেশকারীদের দিক থেকে দুটি রাইফেলের গুলি ছুটে এল। কর্মীরা থমকে দাঁড়াল। তারাও ওই অনুপ্রবেশকারীদের দিকে দু-রাউন্ড গুলি চালিয়ে আবার ছুটলো। ধরতে হবে অনুপ্রবেশকারীদের। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীরা কয়েক মিনিটের সময় পেয়ে গেছে। নিকটেই গ্রামের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে। বি এস এফ কর্মীরা গ্রামের মধ্যে তাড়া করে প্রবেশ করল। কিন্তু সামনে গ্রামের মহিলা, পুরুষ, শিশুরা পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে। তাদের দাবী ওপারের কেউই গ্রামে প্রবেশ করেনি। বাদানুবাদ চলল বহুক্ষণ। ততক্ষণে বি এস এফ-এর ঊর্ধ্বতন অফিসাররাও উপস্থিত হয়েছেন। গ্রামের মহিলারা সুর পালটিয়ে অভিযোগ করতে থাকলেন। বি এস এফ কর্মীরা মহিলাদের উপর অত্যাচার করার জন্য গ্রামে প্রবেশ করছিল। তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে! রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা দিনের আলোয় হৈ হৈ করে এসে বি এস এফ কর্মীদের শাস্তি দাবি করবেন।

বি এস এফ-এর কথা কে বিশ্বাস করবে? ভোট বড় বালাই। ভোর হয়ে গেছে। আবার দেখা হবে অন্য কোনও সীমান্তে অন্য কোনও দিন।

রাতের সীমান্ত : সংকট বাড়ছে দেশের নিরাপত্তায়

নবকুমার ভট্টাচার্য

কাশ্মীর সীমান্তের মতোই বিপজ্জনক বাংলা সীমান্ত। পাকিস্তান সীমান্তের মতোই উদ্বেগজনক অবস্থা বাংলাদেশ সীমান্তে। পাকসীমান্ত থেকে হামলা হচ্ছে বেশি আর বাংলাদেশ সীমান্ত জঙ্গিরা নীরবে ব্যবহার করছে অনুপ্রবেশ করার জন্য এবং যাতায়াতের করিডর হিসেবে। বাংলার সীমান্ত দিয়ে যে জঙ্গিরা ঢুকছে তারা বহুক্ষেত্রে আত্মীয়বন্ধুর ছদ্মপরিচয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার সীমান্তের বিস্তীর্ণ অংশ বিশেষত সুন্দরবন কার্যত মুক্তাঞ্চল হয়ে আছে। সুন্দরবনের সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলোতে দিনেরবেলা গেলে বোঝা যাবে না, রাতের অন্ধকারে এই এলাকা কী বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের আর দশটা গ্রামের মতো দিনের বেলা চাষ, জমিতে হাল বলদ নিয়ে চাষিরা নেমে পড়ে, হাট-বাজারে গ্রামের সরল মানুষদের ভিড়, শিশুরা সময়মতো স্কুল পাঠশালায় হাজিরা দেয় কিংবা গৃহস্থ মেয়ে বৌ-রা পশুপালন করে বা বাড়ির দাওয়ায় বসে বিড়ি বাঁধে। দিনেরবেলার এই শান্ত সুন্দর ছবিটা সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কী করে যে বদলে যায় তা বোঝা দায়। তবে দিনেরবেলাতেও খুব সতর্কভাবে নজর করলে সন্দেহজনক কিছু লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। এরা কারা?

সীমান্ত গ্রামের মানুষরা পুলিশকে ততটা না হলেও বি এস এফ-কে খুবই ভয় করেন। ভিন রাজ্যের এই জওয়ানদের সঙ্গে ভাষাগত কারণে কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আবার সীমান্তে চোরাচালানকারীদের কাছে অনেকে আতঙ্কিত। প্রাণ ভয়ে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে এরা টুঁ শব্দটি করার সাহস পায় না। তবে সীমান্ত এলাকার বেশ কিছু মানুষই মাল পারাপারের সঙ্গে যুক্ত। এরা কেউ লাইনম্যান, কেউ আড়কাঠি, কেউ বা ভ্যান রিকশার ডাকাবুকো চালক। যারা সারাদিন অপরের জমিতে মাটি কেটে পঞ্চাশ টাকাও আয় করতে পারেন না, তারাই অনেক সময় এক রাতের মাল পাচারে চার-পাঁচশো টাকা হামেশাই রোজগার করেন। সীমান্তে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঠিকমতো বোঝাপড়া থাকলে একাজে ঝুঁকি তেমন থাকে না। তবে বি এস এফের বেশিরভাগ সৎ ও দক্ষ অফিসার রয়েছেন যাদের কড়াকড়িতে চোরাচালান বন্ধ থাকে। কিন্তু যেখানে বি এস এফ নেই সেখানে পোয়াবারো পাচারকারীদের। কারণ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। তাই দিব্যি চলছে পাচার। কি নেই পাচারে? সোনা থেকে সুরা, নারী থেকে বড়ি সব যাচ্ছে বাংলাদেশে। আর আসছে এখন দলে দলে মানুষ। তবে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটছে মূলত জলপথে। রাতের অন্ধকারে সীমান্তের নদীতে ভাসমান নৌকাগুলোকে দেখে বোঝা যায় না তারা মাছ ধরছে না লোকপাচার করছে। সীমান্তের নদীগুলোর দু'পারেই রয়েছে এমন বহু ঘাট যেখান দিয়ে ওঠানামার কোনও ব্যবস্থা নেই। দিনেরবেলা লোকজনের কোনও চিহ্নই সেখানে পাওয়া যাবে না, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পর এই ঘাটগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। তাই দিব্যি চলছে পাচার। কি নেই পাচারে? সোনা থেকে সুরা, নারী থেকে বড়ি সব যাচ্ছে বাংলাদেশে। আর আসছে এখন দলে দলে মানুষ।

সুন্দরবন সীমান্ত আজ পাচার এবং জঙ্গি অনুপ্রবেশের সহজতর পথ। কীভাবে এই পথে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটে তা জানতে চাইলে এক পুলিশ অফিসার বললেন, এই এলাকার বেশিরভাগ সীমারেখা নদী ও জঙ্গলে ঘেরা। নদী কোথাও সরু আবার কোথাও চড়া পড়ে বুজে এসেছে। তবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো চলে গিয়েছে খাড়িপথ। জোয়ারে এই খাড়িগুলোতে জল ওঠে, ভাঁটায় তা নেমে যায়। জেলে নৌকাগুলোও এই খাড়ি পথে ঢুকতে সাহস পায় না। কারণ এই পথে যে কোনও সময়ে চুপিসারে নিরস্ত্র মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে পারে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আর এই পথে একবার ভারতে পৌঁছতে পারলেই নানা পথ রয়েছে কলকাতায় ঢোকার।

মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকার মধ্যে পদ্মা নদীও পড়ে। এই নদী পেরিয়ে ওপার থেকে এদেশে আসা যায়। তাই এই নদীকে ঘিরে কড়া নজরদারি থাকেই। বি এস এফ-এর ১০৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানের এই নজরদারি চালিয়ে থাকে। কিন্তু এই পদ্মা নদী সীমান্তে নজরদারিতে সমস্যা তৈরি করছে। বি এস এফ জওয়ানদের মতে, ভাঙনের ফলে প্রহরার কাজে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। প্রতিবছর গঙ্গা পদ্মার ভাঙনে মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তন হচ্ছে। লালগোলা ও জঙ্গিপুরের কয়েকটি গ্রাম পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভাঙনে সীমান্তে কোথাও দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, আবার কোথাও দূরত্ব খুবই কমে গিয়েছে। প্রতিবছর লালগোলার খান্দুয়া বি ও পি থেকে পদ্মার দূরত্ব কমছে। এখন আউট পোস্টের থেকে পদ্মার দূরত্ব মাত্র ৭০ মিটার। লালগোলায় দেড় কিলোমিটার অরক্ষিত জলপথ। এই অরক্ষিত এলাকায় নজরদারি করার জন্য মাত্র দুটো স্পিড বোট রয়েছে। এই লালগোলায় পদ্মার ওপরে দু কিলোমিটার দূরে চরে ৬০০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে নারুখালি চর। এই চরে গড়ে ওঠা হঠাৎপাড়া, নারুখালি, জ্যোতি বিশ্বনাথপুর ও চারাকোট্টা এই চারটি গ্রাম। প্রায় ৩৫০টি পরিবার এই গ্রামে বাস করেন। এই চর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের রাজশাহি জেলা। এই চরের গ্রামগুলি দিনেরবেলা যেন ঘুমিয়ে

থাকে, রাতে বসে মেলার আসর। এই চরে একটি হোটেলও রয়েছে তবে তা অলিখিত। চারাকোট্টায় এই হোটেলটি পরাণ মাস্টারের বিশ্রামঘর বলে পরিচিত। এই চরে মাসের কোনও এক জুম্মাবারে নিশুতিরাতে বসে নিলামের আসর। এই নিলামে কি নেই! হরিণের চামড়া, বাঘের চামড়া থেকে আরম্ভ করে নানা বয়সের মহিলা। নিলাম হওয়া মাল চলে যায় বাংলাদেশে ভোরের আলো ফোটার আগেই। এর পূর্বে সারা মাস ধরে ধীরে ধীরে সংগ্রহ চলে নিলামের বস্তুগুলি। শুধু এখানেই নয় সীমান্ত থানা লালগোলার বিভিন্ন ঘাট দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অবাধে চোরাচালান চলছে।

লালগোলার দশ থেকে বারোটি ঘাট দিয়েই মূলত এই মাল পাচার চলে। এই ঘাট দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে যেমন মাল পাচার করা হয়, তেমনই বাংলাদেশের থেকেও এদেশে সীমান্ত পেরিয়ে মাল আসে। এই পাচারের কাজে যুক্ত রয়েছে মুটে মজদুর থেকে টাকা বদলকারীরাও। স্থানীয় ভাষায় এরা বাটাপার্টি নামে পরিচিত। লালগোলার মূল বাজার এলাকায় প্রতিদিন কেনাবেচার সিংহ ভাগটাই হয় ওপারের থেকে আসা মানুষদের সঙ্গে। লালগোলার কাটাখালি, ময়া, কৃষ্ণমাল, রামনগর, তারানগর, দেশোয়ালিপাড়া, গাবতলা, আসাডিয়াদহ প্রভৃতি ঘাটগুলি রাত হলেই জমজমাট হয়ে ওঠে। দেশোয়ালি পাড়া, ক্লাবভাট পুরপুলিতলা সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা যাবে মাঝবয়সি পুরুষ, মহিলারাও নিশ্চিন্তে মালপত্র নিয়ে সীমান্ত পারাপার করছে। এজন্য ঘাটসংলগ্ন পাড়াগুলোতে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে ছোটোখাটো চা পানের দোকানও খোলা হয়েছে। যে দোকানগুলি দিনের বেলা প্রায় বন্ধই থাকে। সন্ধ্যে সাতটার পর দোকানগুলি খোলা হয়। সীমান্ত আর পাচার যেন মেলায় দেখা গঙ্গা-যমুনা। সীমান্ত থাকলেই পাচার চলবে। সত্যি কথা বলতে কী, সীমান্ত এলাকায় পাচার একটা শিল্প। পাচার বন্ধ হলে হাঁড়ির হাল কী হবে বাংলাদেশের তা অনেকেরই বোধগম্য নয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ছোটবড় মিলিয়ে ৮টি গোরুর হাট বসে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে হরিহরপাড়া, বেলডাঙা, ডোমকল, গোবিন্দপুর, সাগরদিঘি, বড় জ্ঞার ডাকবাংলো, ওমরপুর এবং জলঙ্গীতে গোরুর হাট বসে। জেলার বাসিন্দাদের মতে বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় গোরুর হাট বসার কারণেই পাচারকারীদের এত রমরমা। হাট থেকে গোরু কিনে রাতের অন্ধকারে চোরাপথে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় অনেকেই লিঙ্কম্যানের কাজ করে থাকে। পুলিশের একসূত্র থেকেই জানা যাচ্ছে একটি গোরু ওপারে পাঠাতে পারলেই লিঙ্কম্যানদের ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিহরপাড়া হলো গোরু পাচার চক্রের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে তিনটি পথে বাংলাদেশে গোরু পাচার হয়। রাত একটা থেকে ভোর চারটের মধ্যে স্বরূপপুর ঘাট, ভগীরথপুর ঘাট ও রামপাড়ার ভাঙার দুয়ার ঘাট থেকে প্রায় দিনই গোরু পাচার হয়। অনেকেই জানেন না বীরভূমের লোহাপুর থেকে সাগরদিঘি হয়ে ট্রাকে করে এসে রাজারামপুর ঘাটপাড়া হয়ে লালগোলার বিভিন্ন খাটালে গোরু জমা হয়। এই খাটালগুলোতে গোরুর গায়ে এক, দুই, পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ নম্বর লিখে দেওয়া হয়। এই নম্বরগুলো সেইসব গোরুর মালিকের পরিচয়। পাচারের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেলে বিভিন্ন ঘাট মারফত ওদেশে সেগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই জেলার সীমান্ত এলাকার প্রহরারত বি এস এফ জওয়ানদের অন্যতম বড় সমস্যা জাল টাকা। অনুপ্রবেশের মধ্যে এই সীমান্ত দিয়ে ওপারের থেকে জাল টাকা এদেশে সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে। কখনও দিনেরবেলায় গ্রামবাসীদের মাধ্যমে আবার কখনও রাতের অন্ধকারে।

জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই একটা দুটো জাল টাকা ধরা পড়ে। সাধারণ মানুষের হাত ধরে সেই টাকা আসে বলে কোনও ব্যক্তিকে ধরা পড়ে। সাধারণ মানুষের হাত ধরে সেই টাকা আসে বলে কোনও ব্যক্তিকে ধরা যায় না। সীমান্ত এলাকার রাণীনগর থানার কাহারপাড়া বর্ডার আউটপোস্ট, লালগোলার খান্দুয়া বর্ডার আউটপোস্ট প্রভৃতি এলাকা দিয়ে এই জাল নোটের পাচার সব থেকে বেশি হয়ে থাকে।

আনাজ, চাল, ডাল বিভিন্ন জিনিসের মতো এই এলাকা দিয়ে জাল টাকারও পাচার চলে। এই পাচারের কাজে গ্রামের মহিলা ও শিশুরাও জড়িত থাকে। এই কাজে শিশুদের নিলে ভয় কম থাকে বলে শিশুদের ব্যবহার করা হয়। শিশুরা সহজেই যে কোনও সময় সীমান্ত পারাপার করতে পারে। সন্দেহ না করলে জওয়ানরা তাদের আটকায় না। এই সুযোগে দালালরা তাদের মাধ্যমে টাকা আদানপ্রদান করায়— মাঝেমধ্যে তারা ধরাও পড়ে যায়। বয়সে অত্যন্ত কম বলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা বাংলাদেশের ঢাকা হয়ে প্রথমে সাতক্ষীরা অথবা খুলনাতে আস্তানা নেয়। তারপর নদী পথে সুন্দরবন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকে। সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলের একটি নাম : 'তালপট্টির চর।' এই চরটি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফলে ভারত সরকারের পক্ষে ওই তালপট্টিতে নজরদারি করা সম্ভব হচ্ছে না। আর তারই সুযোগ নিচ্ছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। গোয়েন্দাদের খবর, তালপট্টির ওই চরে সম্প্রতি বাংলাদেশের এক সংস্থা শুঁটকি মাছের ব্যবসা শুরু করেছে। শুঁটকি মাছের ব্যবসাস্থল বলা হলেও কোনও ট্রলার বা জেলেকে ওইখানে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। তাই ওই ব্যবসার নামে সন্ত্রাসবাদীরা নাশকতার কোনও ছক কষছে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত গোয়েন্দারা। ওই তালপট্টিতে বছর খানেক আগে অপহৃত হয়েছিলেন এক জেলে। মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন ওই জেলে। গোয়েন্দারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছেন, জঙ্গলের মধ্যে রীতিমতো গাছ কেটে পাটাতন তৈরি করে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের হাতে রয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। বি এস এফের এক অফিসারের বক্তব্য হলো, সুন্দরবনের ১৩১.৩১ কিলোমিটার সীমান্তের বেশিরভাগটাই কালিন্দী, হাড়িভাঙা, ইছামতী ও রায়মঙ্গলের মতো নদী বেষ্টিত। তাই সাধারণ মানুষ সাহায্য ও সহযোগিতা না করলে প্রশাসনের একার পক্ষে অনুপ্রবেশ ঠেকানো মুশকিল। তবে এই খাড়ি পথকে জঙ্গিরা রুট হিসেবে ব্যবহার করছে— এটা অবশ্য গোয়েন্দাদের জানা।

গহন অরণ্যকে কাজে লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে চলছে মাল পাচার। ওই পাচারের কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে ছোট গতির বোট। নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে ধামাখালি সন্দেশখালি হয়ে রায়মঙ্গল নদী ধরে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে তেরকাঠি জঙ্গল পার হয়ে বাংলাদেশ। এক রাত্রির মামলা। অনুপ্রবেশকারীদের কাছে এটাই নাকি এখন জনপ্রিয় করিডর। জলপথ বলে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সন্দেশখালি ব্লক থেকে সব থেকে বেশি মেয়ে নিখোঁজ হয় অর্থাৎ হারিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে সবাই পাচার হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে আসছে শাড়ী, জাল নোট এবং চীনের তৈরি নানা সামগ্রী। যা পশ্চিমবঙ্গের বাজার গ্রাস করছে।

সীমান্ত এলাকা সমীক্ষা করলে নানা মজার ঘটনা জানতে পারা যাবে। শোনা বা দেখা যাবে পাচারের অভিনবত্ব। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নিকষ কালো অন্ধকার। রাস্তা হিলি সীমানা থেকে সিধে চলে গিয়েছে বালুরঘাট শহরের দিকে। শুনশান চারদিক। এই অন্ধকারের নিশুতি রাতে কোনও কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে কিছু মানুষ। তাদের সঙ্গে সরকারি ছাপ দেওয়া দুটো জিপ। একটু পরে অন্ধকার চিরে একটা ঝরঝরে মার্কা বাস বিকট শব্দ করে এগিয়ে এল। কলকাতামুখী নাইট সার্ভিস। লোকগুলো টর্চের আলোয় ইশারায় বাসটাকে দাঁড় করাল। বিশেষ খবর আছে। সোনার বল আসছে। এই সময় সোনার দারুণ চাহিদা। অথচ সোনা সোজা পথে আনলে ট্যাক্স দিয়ে আর কিছুই থাকে না। তাই বাঁকাপথে পাচার হচ্ছে সোনা। সোর্স-এর কেরামতিতে এক দম্পতি ধরা পড়ল। কিন্তু সোনা কই? স্বামী স্ত্রীর বক্তব্য আমরা কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি। থানায় এনে তল্লাসি করা হলো নিয়ম মেনে। কোথায় সোনা। থানার অফিসারদের মাথায় হাত। সোনার বল চুলোয় যাক্, মানবাধিকার লঙ্ঘন মামলায় না ফাঁসতে হয়। শেষে জোলাপ আনা হলো। মুখ হাঁ করে গেলানো হলো। তারপর অধীর প্রতীক্ষা। কখন হয়। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। সকলের মুখে হাসি। পাক্কা হাফ ডজন সোনার বল পেড়ে তবে সে থামল।

ইঁদুর-প্রেমী

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বর্তমান ইঁদুর দৌড়ের যুগে ইঁদুর নামক প্রাণীটির দৌড়টাকেই আমরা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে তুলেছি, প্রাণীটিকে নয়। আপাতত এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটির নাম কৈলাস চন্দ্র নাতানী। রাজস্থানের জয়পুর শহরের নিকটবর্তী সাঙ্গেনারে অল্প কিছুদিন হলো হার্ডওয়্যার জিনিসপত্রের দোকান দিয়েছেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নাট-বল্টু কিংবা লোহা দিয়ে ইঁদুরেরা ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার কিংবা নিদেনপক্ষে মুখশুদ্ধি করতেও পছন্দ করে বলে কোনও তথ্য প্রাণী বিজ্ঞানীদের হাতে মজুত নেই। সুতরাং কৈলাসবাবুর হার্ডওয়্যারের দোকানে তাদের করবারই বা কি? কিন্তু তাঁর দোকানের আশপাশে বিস্তর গুদাম রয়েছে যাতে ইঁদুরকুলের আকর্ষণ থাকবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে কৈলাসবাবুর দোকানেই বা এত ভীড় কেন ইঁদুরকুলের? জানা গেল, মনুষ্যসমাজের মতো ইঁদুরসমাজও পেটের তাগিদে সারাটাদিন লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এর-তার দোকানে পড়ে থাকে, রাতে চলে আসে তাদের সুখের নীড়ে অর্থাৎ কৈলাসবাবুর হার্ডওয়্যারের দোকানে।

ইঁদুর প্রেম : কৈলাশ চন্দ্র নাতালী তাঁর সাদা ইঁদুরদের খাওয়াচ্ছেন।

কথাগুলো শুনতে এক্কেবারে রূপকথা বলে মনে হলেও, এর মধ্যে এতটুকুও অতিকথন নেই। বাস্তব রূপকথাটা শুনুন তবে এবার। গত মার্চে এই হার্ডওয়্যারের দোকান করার আগে নাতানী'র দোকান ভর্তি থাকতো ইঁদুরে। তারপর হার্ডওয়্যারের দোকান করার পর খাদ্যবস্তুর অভাবে সেই ইঁদুরকুল উবে গিয়েছিল একেবারে। গত এপ্রিলের মাঝামাঝি আমের মরসুমে বাক্স-খানেক আম কিনে এনেছিলেন কৈলাস নাতানী। তাঁর স্ত্রী রুক্মিনীদেবী সেই বাক্স খুলে দেখেন তাতে রয়েছে একটা সাদা ইঁদুর। চিরাচরিত হিন্দু বিশ্বাস মেনে তাকে ভগবান গণেশের মহাআশীর্বাদ বলেই মেনে নেন কৈলাসবাবু ও রুক্মিনীদেবী। কৈলাসবাবু আবার সেই আমের দোকানে যান ও আরও এক বাক্স আম কিনে আনেন। এবারও বাক্স খুলে তাঁর স্ত্রী আরও দু'টো সাদা ইঁদুরের সন্ধান পান। সিদ্ধিদাতার প্রতি অচলা ভক্তিতে একইসঙ্গে ওই ইঁদুরগুলো পাছে বেহাত হয়ে যায় এই ভাবনাতেও তাদেরকে খাঁচা বন্দী করে পোষ মানানোরও চেষ্টা করেন। আপাতত তাঁর সাদা ইঁদুরের সংখ্যা এখন পাঁচ। নামকরণও হয়েছে তাদের গণেশ, রিদ্ধি, সিদ্ধি, শুভ এবং লব। এরাও এখন নাতানী পরিবারের সদস্য।

ইঁদুরের পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যায় তাঁর। ভগবান গণেশের ইচ্ছেতেই বোধহয় রাতের নিশ্চিন্ত আস্তানা হিসেবে ইঁদুরের ঘর আবার ভরে উঠেছে। কৈলাসবাবুর দোকানের আশে-পাশে যেসব দোকানের দোকানদার ইঁদুরের উৎপাতে তটস্থ কৈলাসবাবুর আবেগের কাছে হার মেনেছেন তাঁরাও। কৈলাস নাতানী'র বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই তাঁদের। যদিও তাঁরাও জানেন দিনে-মানে তাদের দোকানে উৎপাতকারী ইঁদুরদের আশ্রয়দাতা শ্রী এবং শ্রীমতী নাতানী-ই। এই দম্পতিকে তাঁরা এতটাই ভালবাসেন যে শত্রু নাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ইঁদুরের ওপর বিষ প্রয়োগও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নাতানী দম্পতির ইঁদুর প্রেম তাঁদেরকে প্রতিবেশীদের কাছে 'চুহা (ইঁদুর) প্রেমী'র স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

যাই হোক, সেই পাঁচটি সাদা ইঁদুরের জন্য দৈনিক দেড়শ'টি টাকা খরচ করতে হচ্ছে নাতানী দম্পতিকে। এদের বৈশিষ্ট্যগুলি একটু শুনে নেওয়া যাক। রিদ্ধি ও সিদ্ধি নাকি খুব দুষ্টু ও খালি বকর-বকর করে। খিদে পেলে রুক্মিনীদেবীর শাড়ি ধরে টানাটানিও করে। তাদের প্রিয় খাদ্য দুধ। কৈলাসবাবুর পুজোর সময় ইঁদুরগুলো তাঁকে ঘিরে বসে থাকে এবং কখনও কখনও তাঁকে নকল করারও চেষ্টা করে। এর মধ্যে গণেশ নামের মহা বিচ্ছু ইঁদুরটি তো পেছনের দু'পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে হাঁটু মুড়ে অবিকল সামনের দু'পায়ে কৈলাসবাবুর মতো প্রণামের ভঙ্গিও করে!

অসমে কেন্দ্র-রাজ্য-উলফা শান্তি বৈঠক

পর্বতের মূষিক প্রসব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ আগস্ট অসম সরকার, কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং উলফার (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম) নেতাদের দিল্লীতে শান্তি বৈঠক যে একরকম ব্যর্থ তা পরবর্তী বৈঠকের সময় সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে দেওয়াতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম শান্তি বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ ও তাঁর মন্ত্রকের কয়েকজন অফিসার, অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এবং উলফা'র চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়াসহ ছয়জন প্রথম সারির নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উলফার অর্থসচিব এবং বিদেশ সচিব চিত্রবন হাজারিকা ও শশধর চৌধুরী, প্রদীপ গগৈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই নেতারা বাংলাদেশের আশ্রয়ে এবং আনুকূল্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। অসম থেকে তোলাবাজির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়ে বাংলাদেশের সোনালী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগও করেছিল বলে খবর। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তারা বেশ অসুবিধায় পড়ে যায়। ২০০৮-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশে খালেদা জিয়াকে হঠিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন।

তরুণ গগৈ

পি চিদাম্বরম

অরবিন্দ রাজখোয়া

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বদান্যতায় উলফা'র কম্যান্ডার ইন চীফ্ পরেশ বরুয়া বাদে অন্য শীর্ষ নেতারা ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। জেলে পোরা হয় উলফা'র শীর্ষ নেতাদের। তারা জেলেই নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রস্তাবে সম্মত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উলফা ক্যাডারদের আক্রমণে এবং বিস্ফোরণে গত ৩২ বছরে অসমে সাধারণ নাগরিক, নিরাপত্তাকর্মী ও উলফা ক্যাডার মিলিয়ে কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়া সম্পত্তি হানি তো হয়েছেই। অসম সরকার-এর পক্ষ থেকে কারও জামিনের বিরোধিতাই করা হয়নি। উল্টে চারশজন আত্মসমর্পণকারী উলফা ক্যাডারদের জন্য দৈনিক দশ হাজার টাকা হিসেবে ভাতা দিয়ে চলেছে--- গত এপ্রিল মাসে বিধানসভা নির্বাচনের মুখেই অসমের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

আলোচনার টেবিল থেকে বের হয়ে শশধর চৌধুরী ও চিত্রবন হাজারিকা একতরফা সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের কাছে বারো দফা দাবী (Charter of Demand) ঘোষণা করে দেন। সেইসব দাবীগুলি হলো—

(১) উলফা'র আন্দোলন-এর ভিত্তিভূমি ও যথার্থ্যতা।

(২) উলফা'র নিখোঁজ নেতা ও ক্যাডারদের বর্তমান অবস্থান।

(৩) সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন— যাতে অসমের মূল নিবাসীদের পরিচিতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ-এর সুরক্ষা হয়।

(৪) বাণিজ্যিক ও আর্থিক ব্যবস্থা— খনি ও খনিজ সম্পদের (তেল সহ) পূর্বেকার রয়ালিটি প্রদান এবং রাজ্যের স্থিতিশীল আর্থিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহারের স্বাধীনতা।

(৫) অবৈধ অভিবাসন— তার ফলাফল এবং প্রভাব। এর প্রতিকার দরকার। আন্তর্জাতিক সীমানা সীল করা। নদী-সীমান্তে নজরদারি। সীমান্তে স্থানীয় নজরদারি বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা।

(৬) জাতিগোষ্ঠীগত বিষয়— সাংবিধানিক পুনর্গঠন। আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিতর্ক মীমাংসা এবং জবরদখল মুক্ত করা।

(৭) অসমবাসীদের পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং রাজ্যবাসীর লাভার্থে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কার।

(৮) কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন।

(৯) জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ-এর অধিকার। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানেজমেন্ট।

(১০) উদ্যোগিক উন্নয়ন। পরিকাঠামো উন্নয়ন। যাতায়াতের অসুবিধা দূর করা। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। ঋণ পাওয়ার সুবিধা। শিল্প-কারখানার জন্য মূলধন বিনিয়োগ।

(১১) পারস্পরিক ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার।

(১২) অসমের মূল নিবাসীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে বজায় রাখা, সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত দাবী-সনদ খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এসব কথা আগের থেকে নতুন কিছু নয়। সবই ''নতুন বোতলে পুরনো মদ''। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলফা নেতাদের যদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল বলে যা প্রচারিত হয়েছে, তা শুধু 'মৌখিক' বলে জানিয়েছেন অরবিন্দ রাজখোয়া।

সব্জির দামে কব্জি ডোবানোই যে মহা মুশকিলের

প্রিয় সব্জি ভাইয়েরা
খুচরো বাজার,

প্রথমেই আপনাদের জন্য রইল প্রাকপুজো অভিনন্দন। তবে পুজোর অভিনন্দনটাও এখনই জানিয়ে রাখা ভালো। এই ভাদ্রেই যা মহার্ঘ হয়েছেন তাতে পুজোর সময় আপনাদের বুকে টেনে নেওয়া যাবে কিনা কে জানে?

মাছ, মাংস তো সারা বছরই মধ্যবিত্তের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকে। ইলিশ, পমফ্রেট, চিংড়ির মতো উচ্চবর্ণের মাছেরা না হয়, উচ্চবিত্তের জন্যেই জন্মান। কিন্তু চারাপোনা, কাটাপোনারাও এখন মোটা মানিব্যাগের বন্ধু। চিকেন, মাটনের জন্য তো সাধারণ মানুষকে নিমন্ত্রণ বাড়ির অপেক্ষায় থাকতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আপনারাই তো ভরসা।

না আপনারা বললেও ঠিক বলা হবে না। সব সব্জিকে তো এক গোত্রে ফেলা যায় না। কোল্ড স্টোরেজের কল্যাণে এখন বারো মাস ফুলকপি পাওয়া যায়। কিন্তু বছরের বেশিটা সময় সাধ হলেও সাধ্যে কুলোয় না। তবে আলু, ঝিঙে, পটল, ঢ্যাঁড়শ তো সব্বার জন্য। কিন্তু তারাও কিনা এখন গড়ে ৫০ টাকা কিলো! ভাবা যায়! বলুন, সব্জি ভায়ারা, আপনারাই বলুন, জমির দাম বাড়ছে, সোনার দাম বাড়ছে কিন্তু বাংলার সব্জিও শেষে বাঙালির ঘরের থাকবে না!

বাংলার মা-মাটি-মানুষ-এর মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন ছেড়ে কথা বলবেন না। তিনি নিজে সংসারি নন। তাই বাজার হাটও করতে হয় না। কিন্তু বাজার দর জানতে কদিন আগেই বাজারে গিয়েছিলেন। টিভিতে ছবি উঠল, ব্রেকিং নিউজ হলো। ব্যাস, আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে সব কাগজ, টিভি নেমে পড়ল খবরে। সব্জি ভায়েরা চলে এলেন হেডিংয়ে। আগুনে বাজারে গিয়ে সারা বছর আম বাঙালির হাতে ফোস্কা পড়ে গেলেও কারও হুঁশ থাকে না। অথচ দেখুন। মুখ্যমন্ত্রী যেই না উবু হয়ে বসে পটলের গায়ে টোকা মারলেন অমনিই সবাই জেগে উঠলেন। তারপর মহাকরণে দফায় দফায় বৈঠক। রোটান্ডায় মিটিং। মন্ত্রী, পুলিশ, আমলাদের আলোচনার বিষয় কিনা উচ্ছে বেগুন পটল মুলো। এখন অবশ্য মুলোর সময় নয় তবু কবিতার লাইন বলে লিখলাম।

তাছাড়া রবি ঠাকুরের লাইন শুনলে মুখ্যমন্ত্রী আনন্দ পান। সেই যে সহজপাঠে ছড়া আছে না, 'উচ্ছে বেগুন, পটল মুলো/বেতের বোনা ধামা কুলো।' অতএব এবার কমিটি হবে, মনিটরিং সেল হবে। তারপর কদিন পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আরে বাবা, ভাবছেন কেন মুখ্যমন্ত্রী তো আর রোজ রোজ বাজারে যান না। আবার কবে মনে পড়বে, তবে যাবেন। ততদিন আপনারা বাঙালিরা হাত পোড়ান। হাতেই থামতে হবে। মুখ বা জিভ পোড়াতে পারবেন না। কারণ সব্জির দামে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াই যে মুশকিল। মুখ বা জিভ অব্দি নিয়ে যাওয়াই তো মুশকিল।

সব্জি ভায়েরা, আপনারা দামি হয়েছেন বলে কিন্তু আপনাদের দায়ী করছি ভাববেন না। আসল প্রশ্ন হলো, এখন বলা হচ্ছে যে, কৃষক দাম পাচ্ছে না, ফড়ে বা দালালরা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেটা রুখতে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এটা আবার ঘটা করে বলার কী আছে? ওটাই তো সরকারের মানে প্রশাসনের কাজ? দালালরা যখন কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াচ্ছে তখন সরকার কী করছিল? কৃষি দফতর, কৃষি বিপণন দফতর এসবগুলো কি শুধু মহাকরণের ঘর দখল করার জন্যই তৈরি? দাম কমাতে গিয়ে আর নিজেদের কৃষক দরদী প্রমাণ করতে অতি উদ্যোগী সরকার আবার সমস্যাও বাড়াচ্ছেন। খোঁজ খবর না নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কৃষক নায্য দাম পাচ্ছে না তাই সরকার এবার সহায়ক মূল্যে চাল কিনবে। এদিকে কৃষকেরা খাপ্পা। হবেই তো! এখন বাজারে কৃষকেরা চাল বিক্রি করছেন কমপক্ষে এক হাজার ৬০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে। সেখানে সরকারের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি এক হাজার টাকা।

আসলে সস্তায় বাজার মাত করাই যেন এই সরকারের আর সরকারের নেত্রীর কাজ। এই যেমন সহজপাঠ নিয়ে উনি যেটা করলেন। ক্ষমতায় এসে থেকে তিনি বারবার বলে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠকে তিনি পাঠ্য করবেন। সেই সহজপাঠ, যেখানে চার সব্জি ভাই উচ্ছে, বেগুন, পটল, মুলোর কথা লেখা আছে। কিন্তু যেটা ক্লাস ওয়ান, টুয়ের ছেলেমেয়েরাও জানেন সেটা মুখ্যমন্ত্রীর জানা নেই। আরে বাবা, এই রাজ্যে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে তো কবে থেকেই সহজপাঠ পড়ানো হয়।

সব কিছুই যে সবাই জানবেন সেটা কোনও কথা নয়। কিন্তু না জেনে সবাই সব কিছু বললেই হয় মুশকিল। আর সেটা লোক দেখানো হলেই মারাত্মক সব ভুল হয়। এই যেমন রবীন্দ্র প্রেম দেখাতে গিয়ে সহজপাঠ নিয়ে সহজ ভুল। চাষিকে অতি প্রেম দেখাতে গিয়ে কম দামে চাল বিক্রিতে বাধ্য করা। আবার উনি বিভিন্ন শহিদ পরিবারের ভালো করতে গিয়ে কিছুদিন আগে সরকারি হুল উৎসবের অনুষ্ঠানে সিধু বাবু, কানু বাবুর পর শহিদ ডহর বাবুর পরিবারের খোঁজ নিয়েছেন আমলাদের থেকে। বিশ্বাস করুন সব্জি ভায়েরা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জানতেনই না যে ডহর কোনও শহিদ বাবু নন, ডহর মানে রাস্তা।

যাক কাজের কথা বলা যাক। আমি জানি এবং মানি যে আপনারা সব্জি ভাইয়েরা নিরীহ, নিরাপরাধ। আপনাদের নিয়ে যারা অসাধু ব্যবসা করছেন তাদেরই যত দোষ। কিন্তু পরিবর্তনের সরকার, মা-মাটি-মানুষের সরকার সারা বছর এই দালালি রুখতে ব্যবস্থা নেবেন তো? নাকি এটা নিছকই হুজুগ হয়েই থাকবে।

কারণ, পুজোর বাজারে 'সব্জি বাজার' নামক নাটকটা জনপ্রিয় হবেই। কিন্তু তারপর?

নমস্কারান্তে—
সুন্দর মৌলিক

তামিলনাড়ুতে ডি এম কে নেতাদের জমি কেলেঙ্কারি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জমি-হাঙরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের ময়দানে নেমেছিল জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে। তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ দু'হাত উজাড় করে ভোট দিয়ে মসনদে বসিয়েছেন জয়ললিতাকে। আর নির্বাচনে জিতেই নিজের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে ব্যবস্থা নিচ্ছেন 'তামিলনাড়ুর আম্মা'। এখনও পর্যন্ত এ-রাজা, কানিমোঝি সমেত করুণানিধির ডি এম কে-র যত আর্থিক অপকীর্তি রয়েছে তার মধ্যে জমি হাঙরদের কীর্তি না জানা গেলে সেই আর্থিক অপকীর্তির বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না।

এর প্রতিবিধান-কল্পে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই যে কাজটা করেছেন, তা হলো রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পুলিসের বিশেষ সেল গঠন। সংবাদ-সংস্থা সূত্রের খবর, এতে বেজায় বিপাকে পড়েছে স্থানীয় ডি এম কে নেতারা। কারণ রাজা-কানিমোঝিদের মিনি এডিশন ওই ডি এম কে নেতারা জমি নিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করেছেন এতদিন। নির্বাচনে এসেই প্রতিশ্রুতি মতো ১০০ দিনে ৫০০ জন-কে জেলে ভরেছে জয়ললিতা সরকার। এরা প্রত্যেকেই জমি-হাঙর বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। ২০১১-এর মে থেকে এখনও অবধি স্পেশাল সেল ২৪৯১টি মামলা গ্রহণ করেছে। ডি এম কে-র বরিষ্ঠ নেতারা ছাড়াও প্রাক্তন মন্ত্রী ভেকাপান্ডি এস আরুমুগাম এবং এন কে কে পি রাজা, চীপকের বিধায়ক জে আনবাজহাগান-এর মতো প্রভাবশালী নেতারাও আপাতত জেলবন্দী। এমনকী কালা ইভানাম সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম কে আলাগিরি-র ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু নেতাকেও জেলবন্দী করা হয়েছে।

জয়ললিতা

আলাগিরি

কানিমোঝি

মুখ্যমন্ত্রী'র ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে যে জয়ললিতার নির্দেশমতো কোনও রাজনৈতিক রং বিচার না করে ক্ষতিগ্রস্তরা যে 'জেনুইন কমপ্লেন'গুলো করেছেন তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে আপাতত এতে প্রচণ্ড বিপাকে পড়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, দেশের আর্থিক কেলেঙ্কারী-তে ইতিমধ্যে মূর্তিমান হয়ে ওঠা এম করুণানিধির পরিবার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলাগিরি'র স্ত্রী ফেঁসে গেছে তাঁর বিরুদ্ধে মাদুরাই মন্দিরের ট্রাস্টের জমি অবৈধভাবে অধিগ্রহণ করার অভিযোগ ওঠায়। জনৈক লটারি ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেই ২৩ একর জমি আলাগিরি-পত্নীকে 'ট্রান্সফার' করে দেন বলে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে যে পিটিশন ফাইল করেছেন মন্দিরের পুরোহিত সুব্রমান্য আইয়ার— তাতে বলা হয়েছে, মাদুরাইয়ের কাছে উথানগুরিতে ১৯৩৬ সালে জনৈক নগেন্দ্র আইয়ার মন্দিরের জমি দান করেন এই শর্তে যে ওই জমি দেবোত্তর সম্পত্তি, কোনওদিন বিক্রয় করা যাবে না।

এই জেলবন্দী নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রী ডি এম কে নেতা এম কে আলাগিরি সম্প্রতি 'প্রিজন-ট্যুর' করেছেন। পালায়নকোট্টাই জেলে দেখা করেছেন তাঁর সহযোগী এন সুরেশ বালু ওরফে পট সুরেশ, জি থোলোপাতিন, কৃষ্ণা পান্ডি-র সঙ্গে। মাদুরাই সেন্ট্রাল জেলে দেখা করেছেন এস এম ইব্রাহিমের সঙ্গে যার বিরুদ্ধে কোদাইকানাল মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থাকার সময়ে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ আছে।

চিঠিপত্র

দেশভাগ ও মৌলানা আজাদ

১৫ আগস্টের স্বস্তিকা পড়ে বেশ মজা পেলাম। দেশ ভাগের ৬৫ বছর পরেও কেউ কেউ অখণ্ড ভারত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আবার কেউ ইসলামি মৌলবাদী মাওলানা আজাদকে দেশভাগ নাটকের পরাজিত নায়ক বানাচ্ছেন। দেশভাগ বলতে গেলে শুরু হয়েছে যেদিন ভারতেরপ্রথম মানুষটি ইসলামায়িত হয়ে ইসলামি অতিজাতীয়তাবাদের (*trans* Nationalism) শরিক হয়েছে। পৃথিবীতে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের শুরু অষ্টাদশ শতাব্দীতে; তার আগে পৃথিবী ছিল রাজাদের। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী ভাবনা- চিন্তা প্রসারলাভ করে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর আরবে এক ভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেন ইসলামি পয়গম্বর হজরত মহম্মদ। তিনি নিজে আরবী কোরেশ সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও এক হাবসী যুবককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। মক্কাবাসী প্রতিমাপূজকদের তাড়নায় একদা প্রাণরক্ষার তাগিদে মদিনায় পালাতে হয় মুহাম্মদকে। মদিনার বহু মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার পরে তিনি ৩১৩ জন মুসলমান নিয়ে বদরের যুদ্ধে এক হাজার কোরেশ প্রতিমা পূজককে (যাদের অনেকেই তাঁর নিকট আত্মীয় ছিল) পরাস্ত করেন এবং ইসলামি উম্মা বা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই উম্মার মধ্যে থাকে ওই হাবসী যুবক আর বাইরে থাকে যাবতীয় প্রতিমা পূজক— যারা আদতে মুহাম্মদের স্বজাতি। ক্রমে মদিনায় ইসলাম বিকশিত হয় একটি রাষ্ট্ররূপে যার শাসনকর্তা, সেনাপতি আইন প্রণেতা ও প্রধান বিচারক হলেন মুহাম্মদ নিজে। কোরানে ইসলামি ঈশ্বর বলেছেন, বিধর্মীদের আনুগত্য করবে না, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে কোরানের সাহায্য নিয়ে। তারা বিধর্মী? যারা কোরান অনুযায়ী বিচার ফয়সলা করে না। মদিনায় মুহাম্মদ সেখানকার ধনী ইহুদীদের সঙ্গেও একটি যুক্তফ্রন্ট করলেন। মক্কার প্রতিমাপূজকদের বিরুদ্ধে তারা এককাট্টা থাকবে। কিন্তু মদিনায় যখন ইসলাম যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করলো তখন যা হলো তা একটি প্রামাণ্য হাদিশ উল্লেখ করেই বলা যাক : সহী মুসলিমের ৪৩৬৩ নং হাদিশটি মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে পয়গম্বরের কথোপকথন প্রসঙ্গে : "আমরা মসজিদে বসেছিলাম, এমন সময় আল্লাহ্‌র রসুল এসে বললেন, চলো ইহুদীদের কাছে যাওয়া যাক।

আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে ইহুদীদের কাছে গেলাম। আল্লাহ্‌র রসুল ডেকে বললেন, হে ইহুদীদের দল, তোমরা ইসলাম কবুল করো, তাতে তোমরা নিরাপদ হবে। ইহুদীরা বললো, হে আবুল কাশিম (ইহুদীরা পয়গম্বরকে 'কাশিমের বাপ' বলে সম্বোধন করতো। পয়গম্বরের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক অকালমৃত পুত্রের নাম ছিল কাশিম) আপনি আমাদের আল্লাহ্‌র বাণী শোনালেন (মুসলমান হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন)। তখন রসলুল্লা বললেন : হে ইহুদীর দল, আমি চাই তোমরা ইসলাম কবুল করে নিরাপদ হও। ইহুদীরা একই উত্তর দিল। এইরকম তিনবার উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর পয়গম্বর বললেন, তোমাদের জানা উচিত, সারা দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল। আমাদের ইচ্ছা তোমাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিই। তোমাদের মধ্যে যার যা সম্পত্তি আছে তা বেচে দিক। তা না হলে জানিয়ে দাও, সারা দুনিয়ার মালিকানা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের।"

উক্ত হাদিশে স্পষ্ট যে গোটা পৃথিবীর একমাত্র মালিক শুধুমাত্র মুসলমানদের উপাস্য আল্লাহ্‌ এবং গোটা পৃথিবীকে উপভোগের জন্য শুধুমাত্র মুসলমানরাই হকদার। মুহাম্মদের সমকালে মদিনায় বসবাসরত প্রধান ইহুদী গোষ্ঠী ছিল তিনটি। তাদের নাম বনি কায়নুকা, বনি নাজির ও বনি কুরাইজা। মুহাম্মদ তাঁদের সঙ্গে প্রথমে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর তাদের ইসলামায়িত করতে সচেষ্ট হন। গররাজী হওয়াতে বনি কায়নুকা ও বনি নাজিরদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। পরে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে সবংশে নিপাত করা হয় কুরাইজা গোষ্ঠীকে। প্রায় আটশো ইহুদীকে মাথা কেটে হত্যা করে মদিনা বাজারে পুঁতে ফেলা হয়। দলপতির সুন্দরী স্ত্রী রাইহানাকে মুহাম্মদ উপপত্নী করেন। তার পরের বছর বনি খায়বার নামক মদিনা বহির্ভূত ধনী ইহুদী গোষ্ঠীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাদের আপন জমিতে মুনিষ খাটার কাজে নিয়োগ করা হয়।

প্রতিটি মুসলমানই ধর্মপ্রাণ, কোরান-হাদিশে বিশ্বাসী। তাদের পক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হওয়া সম্ভব নয়। ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত কি জানেন মুসলিমরা খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল নিতান্তই চাল হিসাবে? আজাদ বলেছিলেন, মুহাম্মদ যেমন মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়েছিলেন আমরাও তেমন যুক্তফ্রন্ট করছি। উপরে যুক্তফ্রন্টের পরিণতি জানিয়েছি। দেওবন্দও একই বক্তব্য নিয়ে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল। আন্সারীও কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। রামগড় কংগ্রেসে সভাপতি আজাদের ভাষণ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে আজাদ মুসলমানদের বিশাল সংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে লড়াই করেছিল মাত্র ৩১৩ জন জেহাদী। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ জীবনের শেষে তাবুকের যুদ্ধে জেহাদে শামিল হয়েছিল ২০ হাজার সৈনিক! আজাদের বক্তব্যের অর্থ ছিল সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে গোটা ভারতই দখল করা যাবে। ডঃ রক্ষিত নাগরকমের 'জেনেসিস অফ পাকিস্তান' পড়তে পারেন। আজাদের বক্তব্য অন্য বইতেও পাওয়া যায়। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ লিখেছেন জামায়েত উলেমা ই হিন্দের বক্তব্য একই রকমের। আজাদের বিশাল পরিকল্পনার তুলনায় জিন্নার পাকিস্তান নস্যি! দেশভাগের সঙ্গে জিন্না জনবিনিময়ও চেয়েছিলেন। তা হলে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন আর সিমির সৃষ্টি হতো না। এই সংখ্যার স্বস্তিকায় শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সিংহ লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম এম এল এ'র সংখ্যা ৫ থেকে ৬০ হয়েছে। ভারতের উত্তর অঞ্চল জুড়ে মোগলিস্তান গড়ে উঠতে খুব বেশী সময় লাগবে কি? বহুবর্ণে ছাপা সাচার কমিশনের রিপোর্টে একটি ম্যাপে মুসলিম প্রধান জেলাগুলিকে সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জেলাগুলি হিমালয়ের প্রান্ত দিয়ে আসাম থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে চলে গেছে। দেশভাগ নিয়ে জিন্না, প্যাটেল, নেহরু আর বৃটিশের বাপান্ত করার হাই-পলিটিক্স আর কদিন চলবে? দেশভাগ নিয়ে গাদাগুচ্ছের বই পড়ার আগে হজরত মুহাম্মদের জীবনীটা একবার পড়ে নেওয়া দরকার।

—প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, নবপল্লী, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

ইফতার ও দুর্গাপূজা

ইতিমধ্যেই মুসলমান ভাইদের পবিত্র 'রমজান' আরম্ভ হয়ে গেছে। ইফতার পার্টির রমরমা। অনেক নেতা-নেত্রী মাথায় টুপি দিয়ে অথবা হিজাব পরে ইফ্‌তার পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কোনও মুসলমান নেতা অথবা ধর্মগুরুকে দিয়ে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করানো আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। অতএব পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোক্তাদের নিকট আমার আন্তরিক অনুরোধ, তারা যেন টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেব, নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব, ফুরফুরা সরিফের ইমাম সাহেব, হুগলীর ইমামবাড়ার ইমাম সাহেব এবং অন্যান্য বিখ্যাত মসজিদের ইমাম সাহেবদের দিয়ে আসন্ন দুর্গাপূজা উদ্বোধন করিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

সমাজ ও রাজনীতি

নীতীন রায়

ধর্মের লড়াই শুরু হয়েছে। অধর্ম পিছু হটতে শুরু করেছে। জাগরণ ঘটতে শুরু করেছে সারা দেশ জুড়ে। সাধারণ মানুষ জুড়তে শুরু করেছে ধর্মের অর্থাৎ কর্তব্য কর্মের সঙ্গে।

আর এই লড়াই শুরু করেছেন দুই ব্যক্তি। একজন আন্না হাজারে আর অন্যজন রামদেব। দু'জনের মধ্যে সাদৃশ্য প্রচুর। দু'জনেই গ্রাম থেকে এসেছেন। জন্মেছেন দরিদ্র পরিবারে। স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করতে পারেননি। আবার আন্না হাজারে বাস করেন মন্দিরে। আর রামদেব মন্দির তৈরি করেছেন। আন্না গ্রাম থেকে শুরু করেছেন ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াই। শ্রমদানের মধ্যে তৈরি করেছেন বাঁধ (ড্যাম)। চাষাবাদের জলের সমস্যা দূর করেছেন কয়েকটি গ্রাম জুড়ে।

রামদেব প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আধুনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ করেছেন। চিন্তা করেন দুর্নীতি মুক্ত শক্তিশালী ভারতের। প্রাণায়ামকে করেছেন সর্বজন গ্রাহ্য।

কিন্তু দুর্নীতি ছেয়ে গেছে সারা ভারতবর্ষে। রাজনীতিবিদ, মিডিয়া, রাজকর্মচারী, কর্পোরেট সেক্টর, খেলার জগত— সবাই ভ্রষ্টাচারে জড়িয়ে পড়েছে। আমজনতা ক্লান্ত। দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়েছে। গ্রামের মায়েদের কাঁধে চাষের জোয়াল। অপুষ্টি ও ভগ্ন স্বাস্থ্য দিন কাটাচ্ছে ৮০ শতাংশ মানুষ। মানুষগুলোর দৈনিক রোজগার ১৫ থেকে ২০ টাকা।

মানবসম্পদ কাজে লাগছে না। আর সমস্ত সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিচ্ছে ২০ শতাংশ মানুষ। তারাই ফুলে ফেঁপে উঠছে। উন্নয়ন বলতে প্রকারান্তরে তাদেরই উন্নতি। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই পয়সা ফেঁকো, ডিগ্রী নাও। স্কুল কলেজগুলোতেও দুর্নীতি। ভর্তি থেকে পরীক্ষা পর্যন্ত। সরকারি স্তরে দুর্নীতি আকাশপ্রমাণ। ২-জি স্পেকট্রাম, এস ব্যান্ড, সি. উব্লু. জি. প্রভৃতি দুর্নীতিতে ভারতবর্ষ কম্পিত। বার বার প্রধানমন্ত্রী আড়াল করতে চেয়েছেন অপরাধীদের। নিজেও পরোক্ষভাবে যেন জড়িয়ে গেলেন।

বার বার বিরোধী দলের দাবি সত্ত্বেও নীরব থেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। সংসদে রাজ্যসভায় বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে সাফাই গেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পার্ষদরা। কিন্তু আদালতের নির্দেশে শেষ রক্ষা করতে পারেননি। সব কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিবশ, যেন মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন ও শকুনি নিয়ন্ত্রণ করছে ধৃতরাষ্ট্রকে। অন্ধ স্নেহ ধৃতরাষ্ট্রের ভালো গুণগুলোকে হরণ করেছে। হরণ করেছে তাঁর মর্যাদাকে। তাই হস্তিনাপুর বিষণ্ণ। সৎ সন্তানরা আক্রান্ত। সময় পাল্টেছে। এখন ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় বিবশ প্রধানমন্ত্রী। পারিবারিক আনুগত্যের ফলস্বরূপ তাঁর এই প্রধানমন্ত্রিত্ব। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবার ক্ষমতা নেই। তোষামদই একমাত্র সম্বল। সোনিয়া ও রাহুলের নির্দেশ পালন করা ছাড়া তার উপায় নেই। দুর্নীতি হলেও তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছেন না। নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন বাইরে থেকে বিবশ মনোমোহন সিংহ।

ধৃতরাষ্ট্রের বিবশতার কারণেই কুরুক্ষেত্রের সূচনা। শ্রীকৃষ্ণের আবেদন নিবেদনকেও পাশ কাটিয়েছেন। নৃপতিসুলভ আচরণ করেননি ধৃতরাষ্ট্র। যারপরনাই মানসিক ও জাগতিক অত্যাচার করেছেন পাণ্ডবদের উপর।

স্নেহান্ধ বিবশতা থেকে ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারেননি— যে দিকে শ্রীকৃষ্ণ সেদিকেই জয় হবে। কারণ সেদিকেই আমজনতা থাকবে। ডঃ মনোমোহন সিংহও বুঝতে পারেননি সোনিয়া-রাহুলই সব নয়। দেশ বড়, ধর্ম অর্থাৎ সত্যেরই জয় হয়। সরকারের বাইরের দায়বদ্ধতা তাকে বিবশ করেছে। এই বিবশতা সারা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

রামদেব ও আন্না হাজারে সেই বিবশতা সরিয়ে আলোর রেখা ফুটিয়েছেন। সমাজকে শক্তিশালী করেছেন। সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চলেছে রাজনীতি। এ হলো ভারতের চিরন্তন পথ। পাশ্চাত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে যা প্রকাশিত হচ্ছে। রাজনীতিবিদদের আর পালাবার পথ নেই।

পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আন্না হাজারে ও রামদেবের শত চেষ্টা তাদের মনকে স্পর্শ করেনি। কম্যুনিস্ট রাজনীতি ইউরোপ থেকে ধার করা। তাই সবকিছুর রাজনৈতিক সমাধান দেয় কম্যুনিস্টরা। পশ্চিমবাংলায় কম্যুনিস্ট রাজনীতির ফলে মানুষ ভাবতেই পারে না রাজনীতির বাইরে কিছু হতে পারে। তাই আন্না ও রামদেব ব্রাত্য।

বাঙালী জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রামদাস, চাণক্য, বিদ্যারণ্যের ভূমিকা। এই সব ঋষিরা সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। বাঙালীরা তাঁদের অনুসরণ করতে ভুলে গেছে। তাই পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু আন্না ও রামদেবের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার। ভারত তার নিজের পথে রাজনীতি ও সমাজের মধ্যে সদর্থক সমন্বয় ঘটাবে। আগামীতে এই সমন্বয়ের মাধ্যমে আমজনতা রাজনীতিতে তার প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করবে।

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

।। পর্ব — ৩।।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

রঘুনাথবাড়ি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঠাকুরবাড়ি ছিল। রঘুনাথের দেউল ও লালজীউর মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে মাকড়া পাথরে তৈরি দেউল-সংলগ্ন 'জগমোহন' এখনও কিছুটা অক্ষত আছে। সামনের নাটমন্দিরের ছাদ বহুকাল আগে থেকে পড়ে গেছে। শুধুমাত্র ছাদের লোহার শক্ত 'বীম' এখনও অক্ষত। এর পূর্ব পার্শ্বে 'চারচালা' শৈলীর বৃহৎ 'তোষাখানা', সেটি একসময় ধনাগার ছিল বলে জানা যায়। বিধ্বস্ত লালজীউ মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে প্রশস্ত 'ভোগশালা', খুবই মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল। এর দুটি অংশ— ভিতর ও বাহির। থামগুলি খুব সুন্দর— পরিভাষায় বলে 'চুম্‌কি' থাম। বিধ্বস্ত লালজীউ মন্দিরের পাশে আছে 'স্নানঘর'। পুষ্যাপূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে বিগ্রহদের স্নান করানো হোত।

কথিত এই মন্দিরগুলি 'রঘুনাথবাড়ি'র একাংশে প্রাচীর ও দ্বিতল প্রবেশদ্বারের দ্বারা বিভক্ত। দ্বিতীয়াংশে প্রশস্ত চত্বরে পঞ্চানন শিবের একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৭ শকাব্দ বা ১৭৬৫ খৃস্টাব্দ। মন্দিরটির সামনে 'মহারাজাধিরাজ' মিত্রসেনের নামাঙ্কিত একটি কামান আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। সেটি বেশ কয়েক বৎসর আগে অপসারিত। এই মিত্রসেন বর্ধমানরাজা কীর্তিচন্দ্রের পুত্র মিত্রসেনের নামাঙ্কিত অথবা 'ভান'-বংশীয় রাজা মিত্রসেনের নামাঙ্কিত কিনা বলা কঠিন। লিপিটি ফার্সি হরফে খোদিত ছিল। ঠাকুরবাড়ির এই দ্বিতীয়াংশে আছে পরবর্তীকালে নির্মিত একটি রাসমঞ্চ, কয়েকটি প্রাচীন সমাধিমন্দির ও প্রধান প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বার ছিল দ্বিতল। সেটি এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। বাইরের দেওয়ালে বর্ধমান রাজা তেজশ্চন্দ্রের সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি সংস্কারকালীন লিপি ছিল। এর থেকে অনুমান করা যায়, বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা চন্দ্রকোণা ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর 'ভান'-বংশীয় রাজাদের নির্মিত বহু মন্দির ও অন্যান্য পুরাবস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, 'রঘুনাথবাড়ি'তে (অযোধ্যাপল্লী) এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। বা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলির নবনির্মাণ কার্য হয়। বহু পরে বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের পুত্র তেজচাঁদ বা তেজশ্চন্দ্র ১৮৩২ খৃস্টাব্দে মন্দিরগুলির সংস্কার করে প্রধান প্রবেশদ্বারের লিপিতে তার উল্লেখ করেন। কিন্তু লালজীউ মন্দিরের পূর্ব রক্ষিত বৃহৎ শিলালিপিটি গিরিধারীলাল জীউর যে 'নবরত্ন' মন্দিরে ছিল ('নবরত্নমিদং দদৌ') সেটি কোথায় ছিল, তা আজও জানা যায়নি। কিন্তু বর্তমান বিধ্বস্ত লালজীউর মন্দিরটি ছিল 'আটচালা' রীতির, 'নবরত্ন' রীতির নয়। ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে সেই 'নবরত্ন' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রানী লক্ষ্মণাবতী।

চন্দ্রকোণার রঘুনাথ বাড়িতে রঘুনাথ ও লালজীউর মন্দিরের সামনে ভগ্ন নাটমন্দির।

ডাঃ আনন্দীবাঈ যিনি স্বামীজীর আগেও আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ফেলেছেন

অজিত কুমার বিশ্বাস

শ্রীরামপুর কলেজ হল ভর্তি। সভায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভীড়। বক্তা ১৮ বছরের মারাঠা ব্রাহ্মণ-বধূ। নাম আনন্দীবাঈ যোশী, স্বামী ডাকবিভাগের কর্মী গোপাল রাও। বক্তৃতার বিষয় 'My future visit to America'। ভাষা ইংরেজী। অত্যন্ত সাবলীল বাচনভঙ্গি।

আনন্দীবাঈ-এর বিয়ে হয়েছে নয় বছর বয়সে। ১১ বছরে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মানোর পর ৩ দিনের মধ্যেই মারা যায়। পুণা শহরে। স্বামীর সঙ্গে বোম্বাইতে থাকার সময় স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।

আনন্দীবাঈ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন কেন তিনি আমেরিকা যেতে চান? ভারতীয় মহিলাদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসাবিদ্যা শেখার কোনও ব্যবস্থা নেই। 'ভারতীয় মহিলাদের এই বিরাট অভাব দূর করার জন্য আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা যাব স্থির করেছি।"

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা বিজয়ের ১০ বছর আগে এই সাহসী মহিলা স্বামী ছুটি পাননি বলে তাই একাই আমেরিকা গেলেন। ৭ এপ্রিল ১৮৮৩ সালে আনন্দীবাঈ কলকাতা বন্দর থেকে 'সিটি অব্ ক্যালকাটা' জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন।

ওই বক্তৃতায় আনন্দীবাঈ বলেন, 'আমার দৃঢ়সংকল্প যে আমি স্বদেশে যেভাবে জীবনযাপন করছি আমেরিকাতেও আমি ঠিক সেভাবেই জীবনযাপন করব। আমেরিকা প্রবাসকালে আমার অন্যতম মুখ্য কর্তব্য হবে আমার পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার ও খাদ্যাভ্যাসে সামান্যতম পরিবর্তন না করা। হিন্দুর মতো আমি সেদেশে যাব এবং থাকব। দেশে ফিরে ও স্বজনদের মধ্যে হিন্দুর ন্যায় বসবাস করব। আমি আমার চাহিদা বাড়াব না। আনন্দীবাঈ স্বধর্মনিষ্ঠ। ভারতীয় পরম্পরায় তাঁর অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল।

ডাঃ আনন্দীবাঈ যোশীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন মহাত্মা সখারাম গণেশ দেউস্কর। এই জীবন আমরা জানতে পারলাম ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্যের লেখা এক অসাধারণ বই থেকে।

পুণার বাসিন্দা রাও সাহেব গোবিন্দ রাও বাসুদেব কানিটকর মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী কাশীবাঈ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আনন্দীবাঈয়ের ৪২৫ পাতার জীবনচরিত রচনা করেছেন।

সখারামের বিশেষত্ব

হলো, দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াসে তিনি অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্মপ্রীতি প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ডাঃ আনন্দীবাঈয়ের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। সখারাম চেয়েছিলেন ভারতীয় নারীরা আনন্দীবাঈ-এর স্বধর্ম নিষ্ঠা ও স্বদেশ প্রেমের ব্রত গ্রহণ করে দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে আসুন। বইয়ের ভূমিকায় সখারাম লিখেছেন :

''ডাক্তার আনন্দীবাঈ মহোদয় মহারাষ্ট্রীয় রমণী সমাজে একটি অমূল্যরত্ন ছিলেন। বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভিন্ন ভারতবর্ষে তাঁর ন্যায় মনস্বিনী মহিলা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। আনন্দীবাঈ মানসিক বলের যেমন আধার ছিলেন, তেমনই স্বদেশানুরাগে এদেশের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ভারতে মহিলাদের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার পথ সুগম করবার জন্য তিনি অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করে স্বীয় ব্যবহারগুণে প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্নেহ ও সহানুভূতিলাভের অধিকারিণী হয়েছিলেন।... তিনি খৃস্টরাজ্য আমেরিকায় তিন বছর বাস করেও স্বধর্মের ও স্বদেশী আচার ব্যবহারের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। আমেরিকা ও লন্ডনে অবস্থানকালেও তিনি আচার-ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে স্বীয় মহারাষ্ট্রীয় বিশেষত্ব একদিনের জন্যও বিসর্জন দেন নাই। ভারতের দুর্ভাগ্য এই বীর মহিলা একবিংশ বৎসর বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন।' গোপাল রাও স্ত্রীকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য বিদেশের সংবাদপত্রে অনবরত সাহায্যের আবেদন করতেন।

অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে আমেরিকার নিউজার্সি অঞ্চলে রোশেল শহরের অধিবাসিনী শ্রীমতি থিও ডোসিয়া এ্যাসি কার্পেন্টার নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা হঠাৎ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একটি পত্রিকা হাতে পান। সেই কাগজে চিঠিপত্রের কলামে গোপাল রাও ও আনন্দীবাঈ-এর কথা জানতে পারেন। ঠিক পরের দিন একটি দৈব ঘটনা শ্রীমতী কার্পেন্টারকে আনন্দীবাঈ-এর প্রতি প্রবল ভাবে আকর্ষিত করে। তিনি পরে জানিয়ে ছিলেন এই ঘটনাটি না ঘটলে তাঁর সঙ্গে আনন্দীবাঈ-এর সঙ্গে কোনও দিনই যোগাযোগ হোত না। সেদিন সকালে শ্রীমতী কার্পেন্টারের নয় বছরের কন্যা ঘুম থেকে উঠে মা-কে গিয়ে বলে, 'মা, আমি স্বপ্ন দেখলাম তুমি যেন হিন্দুস্থানে কাউকে চিঠি লিখছ।'

জাহাজে আমেরিকান জনসন পরিবার আনন্দীবাঈকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নানা প্রলোভনে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। তাকে নানা ভাবে উত্যক্ত করেন অনেকেই খৃস্টান হবার জন্য। আনন্দীবাঈ তথাকথিত সভ্য শ্বেতাঙ্গদের

প্রতি বিন্দুমাত্র অসৌজন্য প্রকাশ করেননি।

অবশেষে ৬৯ দিন জাহাজে যাত্রার পর আমেরিকার বন্দরে প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন মিসেস কার্পেন্টার— আনন্দীবাঈ-এর আমেরিকান মাসিমা।

তিন মাস আনন্দীবাঈ কার্পেন্টার পরিবারে ছিলেন। কার্পেন্টার পরিবারে নানা বিষয়ে হিন্দু রীতিনীতির প্রবর্তন করেন।

আনন্দীবাঈ ফিলাডেলফিয়া মহিলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পাঁচশ মহিলা ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কার্পেন্টার পরিবার থেকে যাবার আগে আনন্দীবাঈ তার আমেরিকান বান্ধবীদের জন্য স্বদেশী পদ্ধতিতে ভোজনের আয়োজন করেন। সেদিন আঠারো জন আমেরিকান মহিলা মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় শাড়ী পরে ভারতীয় বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে টেবিল চেয়ার এবং কাঁটাচামচ ছাড়া হিন্দুরীতিতে পংক্তি ভোজনে আপ্যায়িত হন। ফিলাডেলফিয়া মহিলা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর 'হিন্দু ধাত্রীবিদ্যা' বিষয়ে একটি বই লেখেন। আমেরিকায় থাকার সময় কলেজের অধ্যক্ষা সহ আরও অনেকে আনন্দীবাঈকে খৃস্টান করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র ও নির্যাতন করেছে। তাই আনন্দীবাঈ মিশনারী এবং পাদরীদের ভণ্ড, ক্রূর ও বিশ্বাসঘাতক মনে করতেন। দেশ-বিদেশে একজন ২২ বছরের মহিলা কী প্রভাব ফেলেছেন তা দেখি 'কেশরী' পত্রিকার লেখায়—

'ডাঃ আনন্দীবাঈ যোশী আমাদের ছেড়ে পরলোক চলে গেছেন। তিনি যে উদাহরণ স্থাপন করেছেন, তা বিফলে যাবে না। একজন ব্রাহ্মণ মহিলা বিশ্বে প্রমাণ রেখে গেলেন যে অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থপরতা, অদম্য সাহস এবং নিজের দেশের সেবা করার তীব্র আগ্রহের মতো মহৎ গুণরাজি তথাকথিত অবলা নারীরও থাকতে পারে'।

আমেরিকা থেকে পাশ করে 'ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার' বইটি লিখে ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য একটা অজানা কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ডাক্তার হয়েও বড় ঐতিহাসিকের কাজ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, ট্যাংরা-ধাপা শাখার ডাঃ ভারতী মৈত্র ধন্যবাদের পাত্র। বাংলায় আনন্দীবাঈ-এর জীবনী এত পরে বের হলেও আমেরিকায় তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে আনন্দীবাঈ-এর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কার্পেন্টার পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের মহিলা ন্যান্স স্টোন ১৯৯৩ সালে এক বক্তৃতায় বলেছেন 'মেয়েটি তার নিজের দেশকে ভালবাসত, সে ভালবাসা তার বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেও ভালবাসত।'

ঠাকুরমা বলতেন, 'মেয়েটির এক স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন হলো ডাক্তার হয়ে ভারতের মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো।'

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় পৌঁছবার ১০ বছর আগে আনন্দীবাঈ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ফেলেছেন। আজ তা ভাবতেও অবাক হতে হয়।

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আই এস এ টি টি ডি শাখার জনসেবা প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার
—ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য
প্রকাশক—ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন
মূল্য—১২৫.০০

ভিন্ন ভিন্ন সমাহারে একটি অস্ফুট মৌচাক

শ্যামল ঘোষ

শ্রীমতী প্রণতি চট্টোপাধ্যায়ের কথাশিল্পের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় না ঘটলেও তাঁর 'নীল জোছনায়' নামের ছোটগল্পের বইটি আদ্যন্ত পড়ে বুঝতে পারলাম নিছক সময় কাটানোর তাড়নাতেই তিনি কলম ধরেননি। তাঁর বোধে শিল্পসৃজনের ধারণাটি বেশ স্বচ্ছ। আটটি মাত্র ছোটগল্প ওই ছয় ফর্মার রোগা বইখানির দুই মলাটের মধ্যে বাঁধা পড়লেও, তাঁর পোক্ত কলমের জোরে

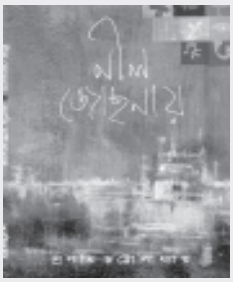

জীবনের অমৃতভাণ্ড থেকে 'ক্ষীরং অম্বুমধ্যাৎ'-এর মতো সারাৎসার অনায়াসে টেনে এনেছেন। ভিন্ন ভিন্ন রসের গল্প পরিবেশনে তিনি যে প্রকৃত রসগ্রাহী মৌমাছি তা বুঝিয়ে ছেড়েছেন। এখন তাই তাঁর অস্ফুট মৌচাকটির প্রতি আমরা একটু একটু করে কেমন লোভী হয়ে উঠছি।

বিশ্ব সাহিত্যে ছোটগল্প নির্মাণ নিয়ে বিস্তর চর্চা ও অনুশীলন চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে। সেই শৈল্পিক কৃষিকর্মে রকমারি ফসলও উঠেছে অঢেল। বাংলা ছোটগল্পও পিছিয়ে থাকেনি। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে তারাও এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। সেই ছোটগল্পের আদর্শ স্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিলে তাঁর অনুবর্তী গল্পকারের দলও নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভিন্ন পথগামী স্বাতন্ত্র্যেও নিজেদের চিহ্নিত করেছেন। কল্লোল কালি কলম শনিবারের চিঠি ইত্যাদি বিগত শতাব্দীর সাহিত্য পত্রপত্রিকা মধ্য দিয়ে একদা নানাভাবে তাঁরা যুগরচনার প্রয়াসী হয়েছেন। ভাষা, বিষয়বস্তু, আঙ্গিকেও ঢের বদল এসেছে। আজও থেমে নেই সেই অনাবিল সৃষ্টিকর্মের ধারাবাহিকতার যুগধর্ম। সৃজনশীল দক্ষতায় বাংলা ছোটগল্প আজ তাই বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনেও নিজেদের ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

ক্ষান্তিহীন এই পথ চলার মধ্যে অগণ্য পদাতিকের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন প্রণতিও। ব্যতিক্রমী সৃজনশীলতা এখনও হয়তো তেমনভাবে তাঁর কলমে ধরা পড়েনি। কিন্তু গোপন থাকেনি তাঁর কারু বাসনাও। তাঁর এই গুটিকতক গল্প যেন 'সার্থকতার তীর্থাভিলাষী'-র ইশারা দিচ্ছে। আগামীতে তাঁর রসঋদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির প্রতীক্ষায় রইলাম। আশা করি অভাজন পাঠকেরা বঞ্চিত হবেন না।

নীল জোছনায় । প্রণতি চট্টোপাধ্যায়
পুঁথিপত্র (কলকাতা) প্রাঃ লিঃ। দাম : ৮০ টাকা

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

হাসি ছড়িয়ে

শুধু হাসিই নানা রোগ নিরাময় করে। হাসি ছড়ালে মানবদেহের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি আলোড়িত হতে থাকে। ফলে শ্বাসনালীর ভেতরকার ময়লা সাফ হয়ে যায়। শ্বসনক্রিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষাকারী রাসায়নিক পদার্থও বৃদ্ধি পায়। পেশি, শিরা-উপশিরাগুলিও নড়াচড়া করতে থাকে। শরীর সতেজ হয়ে ওঠে। শরীরের ব্যথা-বেদনারও উপশম হয়। হাসির সময় মাথাধরা উপশমকারী কিছু পদার্থও দেহে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়, যা মাথাধরা নির্মূল করে। আমেরিকার স্ট্রামফোর্ড মেডিকেল কলেজের মনোবিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়াম ফ্রাই জানিয়েছেন, দমফাটা বা জোরালো হাসিই বেশি কার্যকর।

হিমোগ্লোবিনের কারখানা

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর বিজ্ঞানী রিচার্ড আর বেহ্‌রিংগার কৃত্রিম উপায়ে মানুষের রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরির একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রথমে মানুষের রক্ত থেকে জিন সংগ্রহ করে জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে এই জিন ইঁদুরের রক্তের হিমোগ্লোবিনে প্রতিস্থাপন করে দেখেছেন, ইঁদুরের শরীরে উৎপাদন শুরু হয়েছে মানুষের হিমোগ্লোবিন। গবেষকদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণীর সাহায্যে নিয়মিত মানুষের হিমোগ্লোবিন উৎপাদন করা যাবে। এবং প্রয়োজনে তা মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে সুগম করা যাবে অ্যানিমিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন রক্তজনিত রোগের চিকিৎসা।

কম্পিউটারের কুফল

কম্পিউটারের ওপর অতি-নির্ভরতা বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের চরম ক্ষতি করছে। কমছে বই পড়ার অভ্যেস। শরীরচর্চা খেলাধুলোয় মন নেই। সর্বক্ষণ শুধু ভিডিও গেম আর ইন্টারনেটে নিয়ে মেতে থাকতেই আগ্রহ। চিকিৎসকদের মতে, এর সব থেকে বড় কুফল হলো শিশুদের মস্তিষ্কের যথাযথ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। কারণ ভাববার অবসরই হচ্ছে না তাদের। ফলে সৃষ্টিমূলক কোনও কাজই নবীন প্রজন্মের শিশুরা করতে চাইছে না। এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় এমনই তথ্য মিলেছে।

মেপল মাহাত্ম্য

কানাডার জাতীয় প্রতীক মেপল গাছের পাতার যথেষ্ট পরিচিতি সারা বিশ্বে আরও একটি বিশেষ কারণে। মেপল গাছ থেকে তৈরি হওয়া মেপল সিরাপ নামে একরকম মিষ্টি রসে প্রায় ৫৪ রকমের গুরুত্বপূর্ণ যৌগ আবিষ্কার করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিজ্ঞানী নবীন্দ্র সিরাম। এই গবেষক জানিয়েছেন, মেপল সিরাপে পাওয়া গিয়েছে এমন কিছু ফেনল জাতীয় যৌগ, যেগুলি ডায়াবেটিস মোকাবিলায় খুবই কার্যকরী। রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধী কয়েকটি যৌগও। তাছাড়া একটি আনকোরা নতুন যৌগেরও সন্ধান পেয়েছেন, যাকে আমেরিকার রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক নাম দিয়েছেন 'কুইবেকল'। নবীন্দ্রের ব্যাখ্যা, 'কানাডার কুইবেককে বিশ্বের অধিকাংশ মেপল সিরাপ তৈরি হয় বলে ওই প্রদেশটির সম্মানেই এই নাম।'

রঙ্গকৌতুক

স্বামী : ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম আমার ভুলে-যাওয়া অসুখটার জন্যে।

স্ত্রী : কী বললেন ডাক্তার?

স্বামী : কিছুই বলেননি। অসুখের কথা শুনে ফি-টা আগেই নিয়ে নিলেন।

***

নাতি : দিদু, গাছে ফুল এলে স্প্রিং বলে কেন?

দিদু : পুরনো মডেল তো তাই এখনও স্প্রিঙে চলে—'কোয়ার্টজ' হয়নি।

***

—উস্‌কো খুশ্‌কো চুলের এক ভদ্রলোককে দেখে ক'টা দুষ্টু ছেলে বলল, 'দাদার মাথায় কতো ঘাস গজিয়েছে দেখ্।'

—ভদ্রলোক ঝটিতি উত্তর দিলেন, 'তাই একপাল গরু আমার পিছু নিয়েছে'।

***

পুত্র : বাবা, যিশু বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হোত ২ হাজার ১১ বছর, তাই না!

পিতা : হলে কী হবে, জন্মদিনে অত মোমবাতি নেভাতেই তিনি মরে যেতেন।

***

রোগী : ডাক্তারবাবু, আমার ডান হাতে এত ব্যথা কেন?

ডাক্তার : ও কিছু না, বয়সকালে এমনটি হয়।

রোগী : বয়স তো আমার বাঁ হাতেরও হয়েছে, কিন্তু ব্যথা কই?

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। ফেলুদাকে একবার কোন্ মুগল সম্রাটের মুদ্রার তদন্ত করতে হয়েছিল?

২। ৫০০ টাকার নোটে গান্ধীজির কোন্ আন্দোলনের ছবি দেওয়া থাকে?

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন্ বংশধর উইম্বলডনে বয়েজ সিঙ্গল্‌স জিতেছিলেন?

৪। 'জীবনের জলসাঘরে' কোন্ গায়কের আত্মজীবনী?

৫। কোন প্রসিদ্ধ গায়ক 'কলাবৎ বৈঠকী গানের মজলিস' নামে একটি সংগীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন?

৬। ভারতের কোন্ নাগরিককে প্রথম গণনার আওতায় আনা হয়?

৭। 'ধানের বনে চিংড়িগুলো / লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো/
বিষ্টি ধরার নাচন দেখে / নাচছে ইলিশমাছ।'—কার লেখা?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ ১। জাহাঙ্গিরের, ২। ডান্ডি মার্চ, ৩। লিয়েন্ডার পেজ, ৪। মান্না দে'র, ৫। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত), ৬। রাষ্ট্রপতিকে , ৭। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

।। নীল উপাধ্যায়।।

নর্দার্ন কোলফিল্ডে ২২০ চাকরি

ভারত সরকারের সাবসিডিয়ারি সংস্থা নর্দার্ন কোলফিল্ড বিভিন্ন পদে ২২০ জন লোক নিচ্ছে। পদগুলি হলো—

ডেপুটি মাইন সার্ভেয়ার—মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, ডি জি এম এস অনুদানকৃত সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট অব্ কম্পিটেন্সি কোর্স পাশ হলে আবেদনের যোগ্য। ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবেন। শূন্যপদ—১০ (তপসিলি উপজাতি)।

জুনিয়র ওভারম্যান—কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ—৮০ (সাধারণ-৩৫, ও বি সি—৯, তপসিলি জাতি—১৪, তফঃ উপজাতি—২২।

মাইনিং সির্দার—মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মাইনিং সির্দারশিপের বৈধ সার্টিফিকেট ও ফার্স্ট এড অ্যান্ড গ্যাস টেস্টিং সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণরা আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ—৩৪ (সাধারণ—৮, ওবিসি—২, তফসিলি জাতি—৩, তফসিলি উপজাতি—২১)।

স্টাফ নার্স—উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং 'এ' গ্রেড নার্সিংয়ের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণরা আবেদন যোগ্য। শূন্যপদ—২২ (সাধারণ—২১, ওবিসি—৩, তফসিলি জাতি—৪, উপজাতি—৪)।

জুনিয়র ফার্মাসিস্ট—উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) এবং ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ—১২ (সাধারণ—৮, ওবিসি—১, তফসিলি জাতি—১, উপজাতি—২)।

অ্যাকাউন্টেন্ট—চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সির ইন্টার মিডিয়েট উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ—২৬ (সাধারণ—১৪, ওবিসি—৪, এসসি—৪, এসটি—৪)।

জুনিয়র স্টেনো (ইং)—মাধ্যমিক, ইংরেজি, টাইপিং এবং শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৪০টি এবং ৮০টি শব্দের গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ—১৩ (সাধারণ—৯, ওবিসি—১, তফসিলি জাতি—১, উপজাতি—২)।

জুনিয়র স্টেনো (রাজ্যভাষা)—মাধ্যমিক ও সমতুল। বিষয় হিসেবে হিন্দি থাকা চাই। হিন্দি শর্টহ্যান্ডে মিনিটে—৮০ ও টাইপিং-এ ৪০টি শব্দের গতি থাকা চাই। শূন্যপদ—১৩ (সাধারণ—৯, ওবিসি—১, তফশিলি জাতি—১, উপজাতি—২)

ফরেস্ট সুপারভাইজার—এগ্রিকালচার নিয়ে বি এস্ সি উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ—২ (সাধারণ)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট্ ফোরম্যান—মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা আবেদনের যোগ্য। বয়স—সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩১/৮/১১র হিসেবে ১৮—৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই—লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

সাধারণ কাগজে (এ-৪ মাপের) নির্ধারিত বয়ানে টাইপ করে আবেদন করতে হবে। বয়ান ডাউনলোড করতে পারেন www.ncl.gov.in. ওয়েবসাইট থেকে।

আবেদন পত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে—(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (২) অভিজ্ঞতার শংসাপত্র (যদি থাকে), (৩) সম্প্রতি তোলা এবং গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো। দরখাস্তভরা খামের ওপর লিখতে হবে : Applicantion for the post of....

আবেদন পত্র পৌঁছনো চাই ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ঠিকানায়—

The Depnty General Manager (MP & Rectt),
Northern Coalfields Limited,
Singbhun, P.O. Singrauli Colliery,
Dist. Singrauli (MP), PIN : 486889.

ব্যতিক্রমী পাঠক্রম
অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স

আজকের দিনে বিমা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা। বিভিন্ন সংস্থা তাদের হরেক বিমা প্রকল্প নিয়ে হাজির। আগামী দিনেও নতুন নতুন পলিসি আসবে বাজারে। আর এধরনের নীতি উদ্ভাবনের পেছনে রয়েছেন অ্যাকচুয়ারিরা।

বিভিন্ন ধরনের ইনসিয়োরেন্স (লাইফ, জেনারেল, হেল্‌থ, ইত্যাদি), এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, পেনশন স্কিম-এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়।

ভারতে অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সের পেশায় আসতে হলে যে কোনও প্রার্থীকে অ্যাকচুয়ারিয়াল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া (এ এস আই) দ্বারা পরিচালিত একটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই পরীক্ষার সব ক'টি ভাগ পাশ করতে পারলে তবেই সে অ্যাকচুয়ারিয়াল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার মেম্বার হতে পারবে। অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স পরীক্ষাটি বছরে দু'বার হয়— মে মাসে আর অক্টোবরে।

যে-সব প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর এবং অঙ্কে ভাল, তারাই এই বিষয়টি নিয়ে পড়তে পারেন।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি, পাওয়াই মুম্বই-এ অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সের ওপর তিন বছরের বি এ ডিগ্রি কোর্স করানো হয়। যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স রয়েছে। মেয়াদ দু'বছর। ইকনমিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে সাম্মানিক স্নাতক বা কমার্স নিয়ে স্নাতক অথবা অঙ্ক নিয়ে বিএ (পাস) করার পর এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন প্রার্থীরা।

ইনসিয়োরেন্স, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ছাড়াও অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-এর মতো ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সের ব্যবহার রয়েছে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিমা সংস্থায় অ্যাকচুয়ারিরা কাজ করতে পারেন। ফিনান্স সংক্রান্ত সমাধান, পলিসি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম, ব্যাঙ্কেও এদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বভারতীয় সম্মেলন

গত ২৭ ও ২৮ আগস্ট ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের প্রাথমিক শিক্ষকদের জাতীয় সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক ড. বিমল প্রসাদ অগ্রবাল, সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর প্রমুখ। সারা দেশের ১৭টি রাজ্য থেকে ৭১৪ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

দু'দিনের এই বৈঠকে সার্বজনীন শিক্ষা আইন-২০০৯, মাতৃভাষায় শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি, দেশ গঠনে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের বেতনমানে বিপুল বৈষম্যের বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ছত্রিশগড় বিধানসভার স্পীকার ধর্মলাল কৌশিক, ডঃ বজরংলাল গুপ্তা প্রমুখ। পীতারুণ মুখোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের ১৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ নেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে অজিত বিশ্বাস, স্বপন সমাদ্দার চৌধুরী, সোমেন দাস, নমিতা সাহা, বন্দনা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

গোসাবায় পথসঞ্চলন

গত ২৭ আগস্ট এশিয়ার বৃহত্তম ব-দ্বীপ দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল গোসাবাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি পথসঞ্চলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রথম, সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মাত্র দুটি ব্লকের পূর্ণ গণবেশে ২০০ স্বয়ংসেবক ও নাগরিক বেশে আরও ১০০০ স্বয়ংসেবকের উপস্থিতিতে এক সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত পথসঞ্চলন দেখে গোসাবার মানুষ উজ্জীবিত। আয়লায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর সুন্দরবন অঞ্চলে খাকি হাফপ্যান্ট পরে স্বয়ংসেবকদের ত্রাণকার্য দেখে এলাকাবাসী যেমন উপকৃত ও আনন্দিত হয়েছিলেন, এদিন পথসঞ্চলন দেখে গোসাবাবাসী অভিভূত ও বিস্মিত হয়ে যান।

হলদিয়ায় অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন

হলদিয়া ভবানীপুর থানার সম্মুখে অবস্থিত ''সরস্বতী শিশু মন্দির'' প্রাঙ্গণে ভারতের ৬৫ তম স্বাধীনতা দিবসে ''অখণ্ড ভারত দিবস'' অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়।

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী গীতগোবিন্দ জানা, সমাজসেবী মুরারি মোহন মান্নার উপস্থিতিতে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বক্তারা অখণ্ড ভারত গঠনের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নিজ নিজ সুচিন্তিত অভিমত তুলে ধরেন। শেষে ''শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতি'' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

মালদহ নগরে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

গত ৯ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়াত চারজন স্বয়ংসেবক গোপেশ ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ কেশরী, সঞ্জীব পোদ্দার ও সুকুমার পাত্রর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যক্ত করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রবীণ স্বয়ংসেবক তুষারকান্তি ঘোষ, উত্তরবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, মালদহ বিভাগ সঙ্ঘচালক সুব্রত কুণ্ডু ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোপাল হালদার, সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় সমিতির সদস্য রাধাগোবিন্দ পোদ্দার প্রয়াত গোপেশ ঘোষ ও সুকুমার পাত্রের জীবনের স্মৃতিচারণা করেন।

পাণ্ডুয়াতে জন্মাষ্টমী

গত ২২ আগস্ট প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় জন্মাষ্টমী তিথি পালন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কৃষ্ণ সাজো, রং ভরো প্রতিযোগিতা, নামসংকীর্তন, ভক্তি সঙ্গীত, ধর্মসভা, শেষে পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদুর প্রামাণিক। সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য, সনৎ বসুমল্লিক ও রিপুঞ্জয় চক্রবর্তী জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভা পরিচালনা করেন দুর্গাবাহিনীর প্রান্ত মাতৃশক্তি সংযোজিকা সুভদ্রা শর্মা।

সমাজ সেবা ভারতীর বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন মনোজ চ্যাটার্জী। মঞ্চে বসে (বাঁ দিক থেকে) সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও গুরুশরণ প্রসাদ।

সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক সভা

সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৮ আগস্ট কলকাতায় কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সম্পাদক গুরুশরণ প্রসাদ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সমাজ সেবা ভারতীর গত বছরের প্রতিবেদন পাঠ করা হয়। বিভিন্ন জেলার সদস্যরা সেবা কাজের অনুভবের কথা বলেন। গত বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করা হয় ও অনুমোদিত হয়। এই বছরের জন্য নতুন পরিচালন কমিটি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা হয়।

সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য—সভাপতি, গোপাল চন্দ্র কর—সহ সভাপতি, মানিক চ্যাটার্জী—সহ সভাপতি, সন্দীপ পাল—সাধারণ সম্পাদক, অলোক মুখার্জী—সহ সম্পাদক, শাশ্বতী নাথ—সহ সম্পাদিকা, পিনাকী পাল— কোষাধ্যক্ষ, কমল চ্যাটার্জী—কার্যালয় সম্পাদক। সদস্য—মনোজ চ্যাটার্জী, শিবদাস বিশ্বাস, জয়প্রকাশ গর্গ, অহিজিৎ (পবন) চৌধুরী, সনৎ বসুমল্লিক।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের মর্মস্পর্শী তথ্যছবি 'না'

মিতদ্রু দত্ত।। 'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই...।' চেনা এই গান ভেসে আসছে কানে। পর্দায় ভেসে উঠছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের শস্য-শ্যামলা ছায়াছবি। ওই বাংলার নদী-মাঠ-ভাঁটফুলের অন্যরকম একটি কাহিনী 'না'। সম্প্রতি গোর্কি সদনে 'মিলনী'-র উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক চেতনা শিবিরে প্রদর্শিত হলো এই তথ্যছবিটি। প্রথমে ছিল আলোচনাচক্র 'বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুরা আজ কেমন আছেন'? আলোচক ছিলেন সমীর দেব। এর পরই পর্দায় ফুটে উঠল 'না'। আর নয়। বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী এই তথ্যছবিতে চমৎকার পেশাদারিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক নব্যেন্দু মিত্র। পেশায় তিনি চিকিৎসক হলেও নেশায় তথ্যছবির নির্মাতা। এর আগে অগ্নিপুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র, বীর সাভারকর, চেতনায় নজরুল, যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের মতো জনপ্রিয় তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। ফিরে আসি এই তথ্যচিত্রটির আলোচনায়। রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্বামী তড়িৎ ও দুই শিশুপুত্র সম্বিৎ ও অনিন্দ্যকে নিয়ে এক সুখী পরিবার। নিম্নবিত্ত পরিবার। চাষবাস করেন তড়িৎ। নিজেদের জমি না থাকলেও একটা পুকুর আছে। তাতে মাছ চাষ করেই যা হোক দু-চার পয়সা আয় করে চারজনের এই বাঙালি হিন্দু পরিবার। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস! প্রথমেই সংখ্যাগুরু শাসকেরা তাদের মাছ চাষে বাধা দেয়। জমি কেড়ে নিতে চায়। জোর করে ধর্মান্তরিত করতেও চায়। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও রঞ্জনা প্রতিদিন মা কালীর পুজো করেন। পতিব্রতা এই নারী পরিবারের কল্যাণে রোজ তুলসীতলায় প্রদীপও দেন। প্রথমে হুমকি। তাতে কাজ না হওয়ায় জমি কেড়ে নেওয়া। একঘরে করে দিয়ে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেওয়া। তাতেও এই হিন্দু পরিবার 'অন্য কোনও' ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে না চাওয়ায় পাশবিক অত্যাচারের ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত করল অত্যাচারী শাসকদল। তারা গভীর রাতে ভাঙা বেড়ার বাড়িতে থাকা ওই পরিবারকে ঘিরে ফেলল। রঞ্জনাকে ধর্ষণ করা হলো তার স্বামীর সামনেই। তার স্বামীকে ছুরি মারা হলো। রক্তাক্ত বাবা-মা-কে দেখে দুই শিশুপুত্র তো হতবাক! এ কোথায় তারা বেঁচে আছে। এই কী বাংলাদেশ? যারা এ কাজ করে তারা কি মানুষ? এ প্রশ্নই বার বার উঠে এসেছে মানবিক মূল্যবোধে দৃপ্ত এই তথ্যছবি 'না'-তে। না, আর এমন সন্ত্রাস যেন না ঘটানো হয় বাংলাদেশে— এটিই প্রার্থনা পরিচালকের। একমাত্র আবেদন তাঁর।

সংস্কার ভারতীর কসবা শাখার নটরাজ পূজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সংস্কার ভারতী কসবা শাখা নটরাজ পূজন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৮ জুলাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেদিন অঙ্কনের জগতের শিক্ষাগুরু সুধাংশু শেখর কর মহাশয়কে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৪ জুলাই সন্ধ্যাবেলা গুরু পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে শাখার তরফ থেকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানিয়ে আসা হয়েছিলো। শাখার সদস্যরা অনুষ্ঠানের দিন সম্পাদিকা শ্রীমতী রূপশ্রী দত্তকে সঙ্গীতগুরু রূপে বরণ করে নেয়। সেদিন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কমল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীয় ভাবধারা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। তারপর গুরু বন্দনার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয়। রূপশ্রী দত্তের ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে। 'শ্রী গুরুভ্য নমঃ' নামকরণ করে শাখার সদস্যরা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। আলেখ্যটি রচনা ও পাঠ করেন শাখার সভাপতি শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন রূপশ্রী দত্ত। আলেখ্যটি উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। এছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বর্ণিত 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' থেকে উদ্ধৃত স্বামীজী ও শিষ্যের বাক্যালাপের একদিনের কথোপকথন পাঠ করা হয়। কথোপকথনের বক্তব্য দর্শকবৃন্দের মনে রেখাপাত করে। পারিবারিক প্রতিভার মূর্ছনায় সেদিন মা রূপশ্রী দত্তের সঙ্গীতের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করে মেজ মেয়ে মৌ রক্ষিত এবং নৃত্য পরিবেশন করে বড় মেয়ে সোমা দাস।

কসবা শাখার নৃত্য-গীত পরিবেশন।

শব্দরূপ-৫৯৬ পবিত্র বড়াল

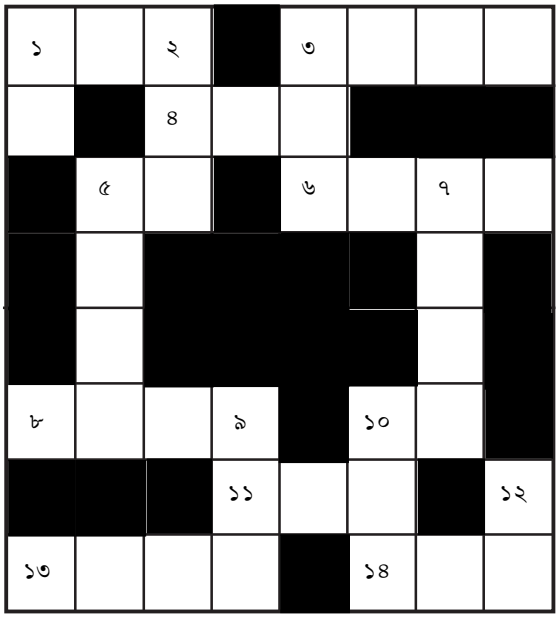

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. পুরীর জগন্নাথের প্রসাদবিশেষ, এক-দুয়ে অষ্টম সংখ্যা, **৩.** ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ বা শুক্ল চতুর্থীর চাঁদ যা দেখলে কলঙ্ক হয়, **৪.** পৌরাণিক মহাবল দৈত্য, কৃষ্ণের পুত্র আগাগোড়া তির, **৫.** রামতনয়, **৬.** স্বর্গের গঙ্গা, **৮.** দীপাধার, একে-তিনে জলাভূমি দুয়ে-চারে এক সংখ্যা, **১০.** রাশিচক্রের প্রথম রাশি ভেড়া সমার্থে, **১১.** দেবতাদের উদ্দেশে স্তুতি, **১৩.** হিমালয়, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ, **১৪.** শ্রীকৃষ্ণ।

উপর-নীচ ঃ ১. সীতাফল, **২.** অন্য নামে শ্রীকৃষ্ণ, প্রথম দুয়ে চুল দিয়ে ভাবুন, **৩.** শক্ত নয়, **৫.** স্থানিক পরিচয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ, শেষ দুয়ে স্বামী, **৭.** স্বর্গের এক কুৎসিত পুরুষ, দেবযোনি বিশেষ, **৯.** —নিমাই, **১০.** স্বর্গের এই অপ্সরী শকুন্তলার জননী, **১২.** লাজ।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৪
সঠিক উত্তরদাতা

অসীম দে
সাহাপুর, মালদহ
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

					অ	ট	বি
	অ	ম্বি	কা		ঞ্জ		ং
অ			হা	য়	না		শ
ম	হা	কা	ল				শ
র				বি	লা	সি	তা
ক		অ	মো	ঘ			ব্দী
ণ্ট		মৃ		ত	প	তী	
ক	পো	ত					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ২১

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
12 September - 2011

দাম : ৫.০০ টাকা